KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection KLMLGK	Publisher [illegible]
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫০/১ ৫০/2 ৫০/৩ ৫০/৪	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯৬ // May 1989 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ // Jun 1989 আষাঢ় ১৩৯৬ // July 1989 শ্রাবণ ১৩৯৬ // Aug 1989
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor আবদুর রউফ	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অগস্ট ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র কি পরস্পর বিরোধী ? "সর্বহারার একনায়কত্ব" কি আসলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একনায়কত্ব ? চীনে দমননীতির প্রয়োগ কি অপরিহার্য ছিল ? এইসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক সুনীল সেনের নিবন্ধ "চীনের ছাত্রজাগরণ"।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় বহুদলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকজন মার্কসবাদী চিন্তানায়কের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তর্কসাপেক্ষ আলোচনা করেছেন তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কৃতভাষাশিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে তারই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মনসুর মুসার আলোচনা "সংস্কৃতভাষা কি মৃত ?"।

সর্বস্তরে সংস্কৃতভাষাশিক্ষার ব্যাপারটা দিন দিন যেভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে প্রচুর তথ্যসহযোগে তা উপস্থাপিত করে সমস্যার প্রতিকার সন্ধান করেছেন প্রদীপকুমার মজুমদার।

"হিন্দি, উর্দু, হিন্দুস্তানি" নিয়ে যে বিতর্ক আজো রয়ে গেছে, যার সঠিক নিরসনের উপর নির্ভর করছে আমাদের রাষ্ট্রভাষার স্বচ্ছন্দ বিকাশ ; এই বিষয়ে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের আলোচনায় রয়েছে সবরকম সংস্কারমুক্ত পাণ্ডিত্য এবং গভীর মননশীলতার ছাপ।

পুরাণখ্যাত কিন্নররা আসলে হিমালয়ের স্বপ্নপরিচিত একটি উপজাতি। এদের মেয়েরা অনেকেই আজো দ্রৌপদীর মত বহুভর্তৃকা। এই কিন্নরদের চমকপ্রদ জীবনচর্যা নিয়ে লিখেছেন কিরণশঙ্কর মৈত্র।

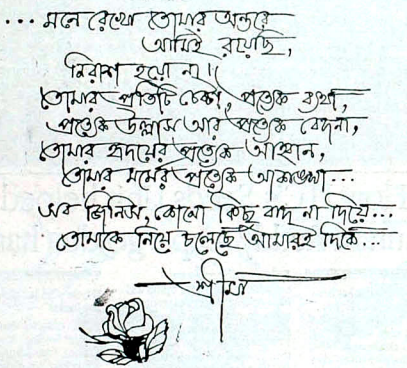

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক কথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ৪
অগস্ট ১৯৮৯
শ্রাবণ ১৩৯৬

চীনের ছাত্রজাগরণ সুনীল সেন ২৯৫

হিন্দি, উর্দু, হিন্দুস্তানি বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ২৯৯

সংস্কৃত ভাষা কি মৃত? মনসুর মুসা ৩১১

সংস্কৃত শিক্ষার হাল-হকিকত প্রদীপকুমার মজুমদার ৩১৫

বাঙলায় বিদ্যুৎব্যবস্থার বিবর্তন অমিতাভ রায় ৩২৮

ছবি সুরজিৎ ঘোষ ৩০৭

আয়েষা শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৩০৮

নগ্ননারী, তোমার সম্মুখে শুধু নতজানু হব মঞ্জুভাষ মিত্র ৩০৯

বিচারের কাঠগড়ায় শনাক্ত করে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১০

এই মানুষগুলো আবুল হাসানাত ৩২২

বিতর্ক ৩৩২
তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জনজীবনচিত্র ৩৪৪
কিন্নরকথা কিরণশঙ্কর মৈত্র

গ্রন্থসমালোচনা ৩৫৩
সনাতন মিত্র, সমীর ঘোষ, মতি মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৩৭৫
অ. কু. ব. ও জাদু-সাহিত্য দিগম্বর দাশগুপ্ত

মতামত ৩৮০
কল্যাণকুমার দত্ত

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

আইনগত সাহায্যদান প্রকল্প

আপনার অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্যের অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে আইনগত সাহায্য দেবেন যদি :—

আপনি শহরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার টাকার) কম।

অবিলম্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য শংসাপত্র নিয়ে আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। কলকাতার জন্য যোগাযোগ করবেন কলিকাতা আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে। ঠিকানা, নগর দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ভবন, ২ ও ৩ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১।

তাছাড়া, সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনগত উপদেষ্টা পর্ষদ (বিচার-বিভাগ), মহাকরণ কলিকাতা-৭০০০০১—এই ঠিকানায়ও আবেদন করতে পারেন।

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন আপনার জেলায় কবে 'লোক আদালত' সংগঠিত করা হচ্ছে। 'লোক আদালতের' তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে। তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।

আই সি এ ৩৪১২/৮৯

চীনের ছাত্রজাগরণ

সুনীল সেন

সত্তর বছর আগে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল সামাজিকভাবে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ চীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে পরাজিত জার্মানির অধিকৃত শানটুঙ প্রদেশ জাপান দখল করে নিল ; প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চীনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হল। তার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে বেরিয়ে এল শতসহস্র ছাত্র। তাদের দাবি : শানটুঙ প্রদেশ চীনের হাতে প্রত্যর্পণ এবং যে তিনজন পদস্থ কর্মচারী জাপানের কাছে চীনের সার্বভৌমত্ব বিক্রি করতে চেয়েছিল, তাদের পদচ্যুতি। পিকিঙে ছাত্র আন্দোলনের শুরু ; এক মাসের মধ্যে শ্রমিক ধর্মঘট হল চীন বিপ্লবের কেন্দ্র সাঙহাইয়ে (৩০ মে, ১৯১৯), এবং নানকিঙে (২৭ মে)। ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চীন "জাপানি দ্রব্য" বর্জনের আন্দোলন চালিয়ে গেল। চীনা সরকারের পুলিশ ছাত্রদের গ্রেফতার করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের জঙ্গি রূপের ধাক্কায় চীনের সরকার ভের্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করল। ছাত্র আন্দোলনের বিজয়পতাকা উড্ডীন হল তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে।

চীনের ইতিহাসে ৪ঠা মে-র ছাত্র আন্দোলন এক দিকপরিবর্তনের সূচনা করেছিল। যে ছাত্রসমাজ শুধু শিক্ষালাভে নিমগ্ন ছিল, এই প্রথম তাদের মধ্যে দেখা গেল রাজনৈতিক চেতনা। বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির কাজে হাত দিলেন। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হল, বিশেষত সাঙহাই শহরে। বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠল মার্কসবাদী গোষ্ঠী ; দু বছর পরে গঠিত হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (১ জুলাই, ১৯২১)। আঠাশ বছর পরে (অকটোবর, ১৯৪৯) কমিউনিস্ট পার্টি চীনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল।

৪ঠা মে-র আন্দোলনের ঐতিহ্য মুছে যায় নি। সত্তর বছর পরে তিয়েন-আনমেন স্কোয়ারে আবার দেখা গেল লক্ষ ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। এই আন্দোলনের পটভূমি ভিন্ন। একদিকে, বিগত দশকে পাশ্চাত্য ভাবধারা সৃষ্টি করেছে ছাত্রসমাজে নতুন প্রাণস্পন্দন ; অপরদিকে, সোভিয়েত রাশিয়ায় অনুসৃত পেরেসত্রোইকা এবং গ্লাসনস্ত ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছে। বহু বছর পরে সোভিয়েত-চীন নেতাদের শীর্ষ-বৈঠক বসেছে। লক্ষ করবার বিষয়, গোরবাচভের আগমনকে স্বাগত জানায় ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্র আন্দোলনের মৌল দাবি কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকারের গণতন্ত্রীকরণ, দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণের অবসান। সাম্যবাদবিরোধী কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হয় নি। প্রথম থেকে ছাত্রছাত্রীরা অনুসরণ করেছে অহিংস সত্যাগ্রহের পথ (অনেকের হয়তো

গ্রামসির "প্যাসিভ রিভোলিউশন"-এর তত্ত্ব মনে পড়বে)।

বিদেশী সাংবাদিকদের মনে হয়েছে, ছাত্রসমাবেশ যেন একটি মেলা ("কার্নিভাল")! কোনো সংগঠিত নেতৃত্ব চোখে পড়ে না। স্থানে-স্থানে দোকান-পাট; ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিদিন খাদ্য আসছে বেজিং শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ছাত্রছাত্রীরা গেয়ে চলেছে পরিচিত আন্তর্জাতিক সংগীত: 'জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা···।' শ্রমিক এবং কৃষকদের সক্রিয় সমর্থনের কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। তবে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ ইতিপূর্বেই সংস্কারের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। "লনডন টাইমস" চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ফ্যাঙ লিঝির কথা লিখেছে। লিঝি যেন রাশিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী শাখারভ, ব্রেজনেভ পর্বে যাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যথারীতি লিঝিকে 'প্রতি-বিপ্লবী' আখ্যায় ভূষিত করে। লিঝি এবং তাঁর স্ত্রী মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। চীনে মানবিক অধিকার আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা লিঝি ("লনডন টাইমস", ১৮ জুন)।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, দমননীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত। ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনারত পার্টির সাধারণ সম্পাদক ঝাওকে দূর-দর্শনে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হলেন। প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ পুরো-ভাগে এলেন। বোধহয় বলা বাহুল্য, পার্টির নীতি যিনি নির্ধারণ করে চলেছেন, তিনি সর্বময় নেতা বৃদ্ধ তেঙ (যাঁর বয়স ৮৪), মিলিটারি কাউনসিলের যিনি সভাপতি। ২০ মে প্রধানমন্ত্রী সামরিক আইন জারি করেন। দলে-দলে ছাত্রছাত্রীরা তিয়েনআন-মেন স্কোয়ার ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করেন; একদল ছাত্র বলেন: 'আমরা এখন যাব গ্রাম-গ্রামান্তরে, কৃষকদের মধ্যে।' শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। ৩ জুন তাঁদের বিরুদ্ধে চালানো হল হিংস্র দমননীতি। শুধু বেজিং নয়, আন্দোলনের সব কেন্দ্রে সেনাবাহিনী হানা দিল। কয়েকজনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে; এদের মধ্যে আছেন একজন ছাত্রী। কত ছাত্রছাত্রী নিহত বা আহত হয়েছেন, তা সঠিক জানা যায় নি। কোনো-কোনো সাংবাদিক লিখেছেন, সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছেন সহস্রাধিক ব্যক্তি। জেলে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অসংখ্য ছাত্র। কয়েকজনকে প্রকাশ্যে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হয়েছে। হঙকঙ থেকে "লনডন টাইমস"-এর সংবাদদাতা ছাত্রী-নেত্রী ছাই লিঙ-এর বিবরণী প্রকাশ করেছেন: অনেক নেতা আত্মগোপন করে-ছেন। বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ওয়াঙ দানের সংবাদ কেউ জানে না। তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে অনশনকারীরা বুঝতে পেরেছিলেন—মৃত্যু আসন্ন। একজন স্কুলের ছাত্র তার শেষ টেস্টামেনটে আনমনে কী যেন লিখে চলেছিল। ট্যাঙ্কের তলায় নিষ্পেষিত হল ত্রিশ-চল্লিশ জন কর্মী। 'গণতন্ত্রের দেবী'র বিশাল মর্মরমূর্তি চুরচুর করে ভেঙে পড়ল ("টাইমস", ১৯ জুন)।

চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞ, বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু নেতৃত্বের সংহতি সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী এদেশে প্রচলিত। কিছু তথ্য জানা দরকার। চীন বিপ্লবের নায়ক মাও স্বয়ং কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান ষাটের দশকে; পরাজিত মাও শুরু করেন সাংস্কৃতিক বিপ্লব। লিউ শাওচি, তেঙ সহ বহু নেতা চরম অবমাননা আর মানসিক নির্যাতন ভোগ করেন; অনেকে আত্মহত্যা করেন। সেদিন মাওয়ের পাশে ছিলেন তাঁর অবিচল সমর্থক এবং উত্তরাধিকারী লিন পিয়াও; সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমর্থন করে তিনি প্রবন্ধ লিখলেন ("সাংস্কৃতিক বিপ্লব", ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস প্রেস, ১৯৬৬)। কিন্তু হায়, তিনিও মাও-বিরোধী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, এবং দেশ থেকে পলায়নের

সময় সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হন। মাওয়ের মৃত্যুর পরে (১৯৭৬) নেতৃত্বের মধ্যে দেখা গেল ভাঙন; তেঙ পুরোভাগে এলেন এবং "গ্যাঙ অব ফোর" (যাঁদের মধ্যে আছেন মাওয়ের চতুর্থ পত্নী এবং তিনজন পুরোনো নেতা) বিচারে দোষী প্রমাণিত হয়ে জেলে নিক্ষিপ্ত হলেন। তেঙ পর্বে আধুনিকী-করণের কর্মসূচী গৃহীত এবং রূপায়িত হতে থাকে। চীনের প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক অস্ত্র। চীন-আমেরিকা মধুচন্দ্রিকার যুগ শুরু হল। তেঙ স্বয়ং আমেরিকা সফর করলেন। ১৯৮৭ সালে ছাত্রবিক্ষোভের গুরুগর্জন শোনা গেল। তদানীন্তন পার্টির সাধারণ সম্পাদক হু ইয়াও পাঙ ছাত্রদের দাবি আংশিকভাবে সমর্থন করেন। হঠাৎ তিনি পদচ্যুত হন। ১৯৮৯ এপ্রিলে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যু ছাত্রদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঝাও, যাঁর ভাগ্যে ঠিক কী আছে তা এখনো বলা যায় না। তবে ইতিমধ্যে সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে তিনি অপসারিত হয়েছেন। চীন-ভক্তদের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ইতিহাস একটু জানা উচিত। বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করলে শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয়। নেতাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্যক্তিপূজা মার্কসবাদের বিরোধী।

মাও পর্ব থেকে তেঙ পর্ব পর্যন্ত যে প্রতিষ্ঠানের সংহতি অটুট, সেটি হল গণমুক্তিফৌজ, যার প্রধান স্রষ্টা মাও এবং চু তে, যার সভ্যসংখ্যা ৩৪ লক্ষ। চীনে গৃহযুদ্ধ আসন্ন—এই মর্মে কিছু সাংবাদিকদের প্রতিবেদন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। গৃহযুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা চীনে নেই। কিন্তু মুক্তিফৌজের সংহতি এত বছর ধরে অটুট রইল কেন? সম্ভবত এর একটি কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কৃষকসমাজ মোটামুটি সন্তুষ্ট, আর মূলত কৃষকদের মধ্য থেকে উঠেছেন মুক্তিফৌজের নেতারা। অনেকের মতে, কমিউনিস্ট জগতে ভূমি-সংস্কার সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছে চীনে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে চীনের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অমর্ত্য সেনের প্রবন্ধ মনে পড়ে, যার ধারেকাছেও প্রবীণ অর্থনীতিবিদ কে. এন. রাজের লেখা আসতে পারে নি। সেন বনাম রাজ বিতর্ক চীনের কৃষির উপর আলোকপাত করে।

চীনের ছাত্র আন্দোলন চূর্ণবিচূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ সগর্বে ঘোষণা করেছেন: 'প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ' মূলত সমাপ্ত। আমাদের সৈন্যরা যে সংযম দেখিয়েছে তা অসাধারণ ("স্টেটসম্যান", ২০ জুন)। চীনের নেতারা আরো বলেছেন, 'প্রতিবিপ্লবের' উৎস পাশ্চাত্য 'বুর্জোয়া ভাবধারা'। কিন্তু ঘটনা হল, চীনে "উন্মুক্ত দরজার" নীতি যিনি শুরু করেন তিনি তেঙ। প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য আমেরিকায় গিয়েছেন। চীনে আমেরিকা নিয়োগ করেছে বিপুল পরিমাণ ডলার; চীনের বাজারে মার্কিন দ্রব্যের ছড়াছড়ি। মার্কিন অস্ত্রে চীন সজ্জিত। নিয়তির পরিহাস, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ চীনে দমননীতির প্রয়োগ সমর্থন করেন নি। আমেরিকার জনমতকে শান্ত করার জন্য ধুরন্ধর সাম্যবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিক ড. কিসিনজার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন: 'মার্কিন গণতন্ত্র চীনের কাছ থেকে আশা করা ভুল। দেশের দীর্ঘকালীন স্বার্থের প্রেক্ষিতে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত।' এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্তে চীনের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তাঁর মনোবাসনা বোধহয় পূর্ণ হবে না। চীনের ব্যাপারে গোরবাচেভের বক্তব্য এখনো অত্যন্ত সংযত। বরফ সত্যি গলেছে। চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক ক্রমশ স্বাভাবিক হবার সম্ভাবনা।

বুদ্ধিজীবীদের মনে অনেক প্রশ্ন জমেছে। সাম্যবাদ এবং গণতন্ত্র কি পরস্পরবিরোধী? 'সর্বহারার এক-নায়কত্ব' কী আসলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একনায়কত্ব? চীনে দমননীতির প্রয়োগ কি অপরিহার্য ছিল?

হাতের কাছে যে তথ্য আছে তার ভিত্তিতে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। কিছু মন্তব্য নিশ্চয়ই করা সম্ভব। পেরেসত্রোইকা এবং গ্লাসনস্তের ধাক্কায়

কমিউনিস্ট জগতে যে আলোড়ন চলছে, চীনের ঘটনা তার অঙ্গ। পার্টি এবং প্রশাসনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি সব দেশেই উঠেছে। কিন্তু চীন ছাড়া দমননীতির প্রয়োগ এখনো অন্য কোনো কমিউনিস্ট দেশে দৃশ্য হয় নি। পোলানডের স্বাধীন নির্বাচন তো অভূতপূর্ব। বর্তমান লেখকের প্রত্যয়, চীনে 'আধুনিকীকরণ' (যার প্রবক্তা তেঙ) এবং গণতন্ত্রীকরণ এক স্রোতে মিলিত হবে। মাওবাদ আর ফিরে আসবে না। চীনের বর্তমান বাস্তবের সঙ্গে মাওবাদের সঙ্গতি নেই।

এঙ্গেলসের উক্তি মনে পড়ে : 'History is the most cruel of all goddesses. She drives her triumphal chariot over heaps of corpses…।' ইতিহাস বড়ো নিষ্ঠুর। রক্ষণশীল নেতৃত্ব বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হবেন। নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করবে নতুন নেতৃত্ব। চীনের ছাত্রজাগরণ তার সংকেত। ৪ঠা মে-র আন্দোলন চীনের অচলায়তন ভেঙে ফেলতে সহায়ক হয়েছিল ; বর্তমান আন্দোলনও চীনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধাক্কা যে কমিউনিস্ট পার্টি সামলে নিয়েছে, মনে হয় সেই পার্টির সমষ্টিগত চেতনা একটি চক্র মুছে ফেলতে পারবে না। ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা উন্নত স্তরে উঠে গিয়েছে।

চীনা পার্টির মধ্যে ঘনায়মান দ্বন্দ্ব বুঝতে সুবিধা হয়, লেনিনোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী গ্রামসির উক্তি স্মরণ করলে : 'When the Party is progressive it functions democratically. When the Party is regressive it functions bureaucratically…It is then technically a policing organism।' কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোর উপর আলোকপাত করে গ্রামসির মন্তব্য।

হিন্দি উর্দূ হিন্দুস্তানি

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১. হিন্দি সাহিত্যে ভাষাবৈচিত্র্য : পিঙ্গল, অওধি, ব্রজভাষা, খড়িবোলি

হিন্দি-উর্দূ ভাষার উদ্‌ভব, বিবর্তন এবং হিন্দি-উর্দূ সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র। অন্যান্য ভারতীয় ভাষা আর সাহিত্যের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা এবং সঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হয়, হিন্দি-উর্দূর ক্ষেত্রে তার আপেক্ষিক অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রথমে হিন্দির কথা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রসঙ্গক্রমে উর্দূর কথাও এসে যাবে। হাজার বছরের হিন্দি সাহিত্য একাধিক ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। বাঙলায় কিন্তু তেমনটি ঘটে নি। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আলাওলের পদ্মাবতী, অন্নদামঙ্গল, সারদামঙ্গল এবং গীতাঞ্জলির ভাষা ঠিক এক না হলেও, কালের প্রভাবে একই ভাষার বিবর্তিত রূপ। হিন্দিতে চাঁদ বরদায়ি (দ্বাদশ শতাব্দী) থেকে শুরু করে মধ্যযুগের কবির - সূর - তুলসী-কেশব-বিহারী, এবং আধুনিক যুগের ভারতেন্দু-পন্ত-নিরালা-প্রসাদ ও মৈথিলীশরণ গুপ্ত পর্যন্ত যে সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত, তার মধ্যে প্রধানত চারটি ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়—পিঙ্গল, অওধি, ব্রজভাষা খড়িবোলি। উর্দূ বা হিন্দুস্তানিও গড়ে উঠেছে এই চারটি ভাষার অন্যতম খড়িবোলিকে কেন্দ্র করে।

২. ভাষাবৈচিত্র্যের মূলে কবিদের স্থানিক দূরত্ব এবং একটি নির্দিষ্ট শিষ্ট ভাষার অভাব

ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মতো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের বিশেষ একটি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার ফলে প্রাচীন এবং মধ্য যুগের হিন্দি সাহিত্যে ভাষাগত বৈচিত্র্য আর জটিলতা সবচেয়ে বেশি। এই ভাষাগত অনৈক্য কেবল কালের ব্যবধানের জন্যই নয়, স্থানের ব্যবধানের জন্যও বটে। চাঁদ বরদায়ি আর অমীর খুসরোর মধ্যে কালগত

(হিন্দি উর্দূ 'সংসার' বিষয়ে যাঁর বিশেষ আগ্রহ, সেই পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে)

ব্যবধান ৭০ বছরের বেশি নয়, কিন্তু ভাষার পার্থক্য অনেক বেশি। সুরদাস আর মলিক মুহম্মদ জায়সী ছিলেন সমসাময়িক কবি কিন্তু তাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র। সুরদাসের রচনা ব্রজভাষায়, আর জায়সী লিখেছেন অওধিতে। বস্তুত হিন্দি কবিদের আঞ্চলিক ব্যবধান খুবই বেশি।

৩. এ যুগের একমাত্র শিষ্ট ভাষা খড়িবোলি, সে যুগে ছিল ব্রজভাষা

অবশ্য সাহিত্যরচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাষার প্রচলন থাকলে স্থানগত ব্যবধানে কিছু আসে যায় না। যেমন, আধুনিক যুগের সমস্ত হিন্দি লেখক সর্বত্রই একটিমাত্র শিষ্ট ভাষাকে অবলম্বন করেছেন বলে আম্বালা-দিল্লী-আগরা-কানপুর-এলাহাবাদ-বারাণসী-পাটনা-কলকাতার হিন্দি রচনায় ভাষাগত বৈষম্য কিছু নেই। রচনাশৈলীর পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তা ভাষার অনৈক্য নয়।

প্রাচীন যুগের হিন্দি সাহিত্যে ব্রজভাষা অনেকাংশে শিষ্টভাষারূপে গৃহীত হলেও তা কখনোই কথ্যভাষা-রূপে আধুনিক খড়িবোলির মতো ব্যাপক প্রচার লাভ করতে পারে নি। সেই কারণে প্রাচীন সাহিত্যে ভাষাগত অনৈক্য বেশি। খুসরো খড়িবোলিতে লিখেছেন তো চন্দ বরদায়ি লিখেছেন পিঙ্গলে। সুরদাস ব্রজভাষার কবি তো তুলসীদাস অওধির। আধুনিক কালে এই জটিলতা নেই। বর্তমানে কুমাউনের পন্ত-ইলাচন্দ-জোশী থেকে মিথিলার রামধারী সিংহ দিনকর পর্যন্ত সকলেই এক খড়ি-বোলিতে রচনা করেন।

৪. হিন্দি কোনো একটি ভাষা নয়, ভাষার সমষ্টি

প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পিঙ্গল, অওধি, ব্রজভাষা ও খড়িবোলিতে রচিত সাহিত্য হিন্দি সাহিত্য নামে পরিচিত। উত্তর ভারতের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে হিন্দি ভাষা আর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়, সেইসমস্ত ভূমি-খণ্ডের বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষাও হিন্দির অন্তরভুক্ত। সুতরাং ভাষাশাস্ত্র অনুসারে না হোক, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে হিন্দি কোনো বিশেষ ভাষাকে না বুঝিয়ে ভাষাসমষ্টির নামরূপেই গৃহীত হয়ে থাকে। সেই ভাষা আর উপভাষার সংখ্যা বড়ো কম নয়, কিন্তু আপাতত সে হিসাবে আমাদের প্রয়োজন নেই।

৫. হিন্দি সাহিত্যের আদিযুগে পিঙ্গলের প্রাধান্য কেন?

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে, হিন্দি সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে অওধি, ব্রজভাষা আর খড়িবোলির পরিবর্তে পিঙ্গল প্রাধান্য লাভ করল কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে হিন্দি ভাষা আর সাহিত্যের উদ্‌ভবকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাকালে। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে রাজপুত রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাই সবচেয়ে বেশি। উল্লেখযোগ্য রাজপুত বংশের মধ্যে দিল্লী-আজমীঢ়ে চৌহানবংশ, কনৌজে রাঠোর বংশ এবং মহোবা-কলিনজরে চন্দেলবংশ। মোট কথা, হিন্দি ভাষা আর হিন্দি সাহিত্যের পত্তন-কালে উত্তর ভারতের ইতিহাসে রাজস্থান এবং রাজপুতদেরই প্রাধান্য। প্রারম্ভিক যুগের হিন্দি সাহিত্যের যতটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই রচিত হয়েছে রাজপুতানায়। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে, সে যুগের চারণকবিদের রচনায় সাহিত্যিক অপভ্রংশ, ব্রজভাষা আর রাজস্থানীর মিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্র সাহিত্যিক ভাষার নামই পিঙ্গল, এবং এতেই রচিত হয়েছে হিন্দি সাহিত্যের আদিযুগের বীরগাথাকাব্য—খুমন রাসো, বীসলদেব রাসো, চন্দ বরদাই-এর পৃথ্বীরাজ রাসো প্রভৃতি।

৬. ষোড়শ শতকে অওধ অঞ্চলে সুফী কবিদের হাতে উৎকৃষ্ট আখ্যানকাব্য রচনা

হিন্দি সাহিত্যের আদিযুগে (দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত) অওধি ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাষায় অনেকগুলি আখ্যানকাব্য রচিত হয়। রচয়িতাদের প্রায় সকলেই ছিলেন সুফী মুসলমান। এঁদের মধ্যে মলিক মুহম্মদ জায়সী-রচিত "পদ্মাবত" হিন্দি সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। তুলসীদাসও তাঁর অমর গ্রন্থ "রামচরিতমানস" রচনা করেন এই ভাষায়। এইভাবে আখ্যানকাব্য রচনায় অওধি ভাষার কবিরা যে সাফল্য লাভ করেন, হিন্দি সাহিত্যে তা তুলনাহীন।

৭. অওধির সমকালীন ব্রজভাষার অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা

কিন্তু ব্রজভাষার সম্মুখে সাহিত্যিক ভাষারূপে অওধিও বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারল না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানত ব্রজভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস। বিশুদ্ধ ব্রজ-সাহিত্যের প্রকৃত আরম্ভ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মথুরা অঞ্চলের বৈষ্ণব সাধক বল্লভাচার্যের (১৪৮০-১৫৩২) প্রেরণায় ব্রজভূমিতে যে কৃষ্ণভক্ত কবিসম্প্রদায় গড়ে ওঠে, তাঁদের হাতেই ব্রজসাহিত্যের লক্ষণীয় চর্চা শুরু হয়।

সাহিত্যে প্রায় একই সময়ে অওধি আর ব্রজভাষার ব্যবহার আরম্ভ হলেও একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস এক প্রকার ব্রজসাহিত্যের ইতিহাস। জায়সীর "পদ্মাবত" আর তুলসীদাসের "রামচরিতমানস"-এর কথা বাদ দিলে মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যের অন্যান্য রচনা ব্রজভাষায় রচিত। এমনকী স্বয়ং তুলসীদাস পর্যন্ত তাঁর "গীতাবলী", "বিনয়পত্রিকা", "কবিতাবলী" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ লিখেছেন ব্রজভাষায়। আসলে অওধি কখনো ব্রজভাষার মতো ব্যাপক কাব্যভাষা হয়ে উঠতে পারে নি। অওধ অঞ্চলের বহির্ভূত কোনো কবি অওধিতে কাব্যরচনা করেছেন বলে জানা যায় নি। কিন্তু সাহিত্যিক ব্রজভাষার চর্চা হয়েছিল সর্বত্র।

এর কারণ কী? ব্রজভাষার পূর্বদিকে অওধি আর উত্তরদিকে খড়িবোলির মতো দুই শক্তিশালী ভাষা থাকতে হিন্দি সাহিত্যে ব্রজভাষারই প্রতিষ্ঠা হল কেন? প্রধান কারণ মনে হয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুত্থান। কৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধাম। ব্রজের ভাষা কৃষ্ণেরই ভাষা—এই বিশ্বাসে কৃষ্ণভক্ত কবিরা ভজন-কীর্তনের জন্য ব্রজভাষাকে অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে ব্রজলীলার মাধুরীর মতো ব্রজভাষার পদ-মাধুর্যেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ষোড়শ শতকের গোড়ায় কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে যে ব্রজসাহিত্যের সূচনা, পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে তার অনুশীলন আর সমৃদ্ধি হতে থাকে। যাঁদের চেষ্টায় ব্রজ-ভাষা আর-সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করে, তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু কবি ছিলেন মুসলমান। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে দিল্লীর পাঠান সরদার সৈয়দ ইব্রাহিম ছিলেন এই কবিকুলের চূড়ামণি—যাঁর আসল নাম বিস্মৃত হয়ে লোকে তাঁর ছদ্মনাম 'রসখান'কেই মনে রেখেছে। ব্রজসাহিত্য হিন্দি জগতের অনুপম রত্ন।

৮. ব্রজভাষার পতন আর খড়িবোলির উত্থান

ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিন যে ভাষা প্রায় একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে সমগ্র হিন্দি প্রদেশে প্রায় তিন শতাব্দীরও অধিককাল প্রচলিত ছিল, আজ তা ব্রজমণ্ডলের একটি আঞ্চলিক কথ্যভাষারূপে বেঁচে আছে মাত্র। হিন্দির যে রূপকে রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার সম্মান দেওয়া হয়েছে, তা সুরদাসের হিন্দিও নয়, রামচরিতমানসের হিন্দিও

নয়, তার নাম খড়িবোলি। বর্তমান উত্তর ভারতে খড়িবোলি এত প্রসার লাভ করেছে যে জনসাধারণ হিন্দি বলতে এই খড়িবোলিকেই বুঝিয়ে থাকে। মধ্যযুগে ব্রজ এবং অওধি সাহিত্যে ব্যবহৃত হলেও বোলচালের ভাষারূপে তাদের ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজ হিন্দি সাহিত্যের গদ্যে পদ্যে যেমন খড়িবোলির পূর্ণ আধিপত্য, তেমনি সমগ্র উত্তর ভারতে শিক্ষিত জনগণের ব্যবহারিক বিচার-বিনিময়ের ভাষা খড়িবোলি। দিল্লী এবং পার্শ্ববর্তী পাঁচটি জেলার (মেরঠ বা মীরাট, মুরাদাবাদ, মুজফফরনগর, সাহারানপুর ও আম্বালা—এই পাঁচটি জেলার) ভাষা/উপভাষা কী ভাবে এমন অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হল, তার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

৯. খড়িবোলি আর মুসলিম সমাজ

অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার মতো অপভ্রংশ থেকে খড়িবোলিরও উৎপত্তি হয় একাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই যে তুর্কি মুসলমান কর্তৃক দিল্লী অঞ্চল অধিকৃত হয়, তাঁদের নিজস্ব ভাষা তুর্কি হলেও ব্যবহারিক জীবনের ভাষা ছিল ফারসি। প্রথম-প্রথম এই বিজেতা সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টা করলেও ধীরে-ধীরে তাঁরা ভারতীয় ভাষা আর সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মেলামেশার ফলে এবং বেশ কিছু হিন্দু ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজে হিন্দু রক্ত প্রবাহিত হয়। এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে ফারসির প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় ভাষার প্রচলন ঘটতে শুরু করে এবং দু-তিন পুরুষের মধ্যেই মুসলিম সমাজ দিল্লী অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাকে মাতৃভাষারূপে স্বীকার করে নেন। ক্রমে-ক্রমে এঁদের মধ্য থেকেই ভারতীয় ভাষা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে—অমীর খুসরো, আকবর, ফৈজী, আবুল ফজল, আবদুর রহিম খানখানা, দারা-শিকোহ প্রভৃতি।

১০. হিন্দ্-হিন্দি-হিন্দু

সে যুগে পারস্যের মুসলমান সিন্ধুনদের পূর্বাংশকে বলতেন 'হিন্দ্,' এবং ভারতীয় মুসলমানদের পরিচিতি ছিল 'হিন্দি' (অর্থাৎ হিন্দ্-এর অধিবাসী) রূপে। অমীর খুসরো (১২৫৫-১৩২৪) ভারতীয় মুসলমান অর্থেই 'হিন্দি' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। সাধারণ ভারতবাসীর পরিচয় 'হিন্দু' নামে এবং ভারতীয় মুসলমানদের পরিচয় 'হিন্দি' নামে। ক্রমে তাঁদের ব্যবহৃত ভাষার নামও হয় হিন্দি। সুতরাং ভাষার অর্থে 'হিন্দি' শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় মুসলমানদের মুখে, এবং শব্দটির প্রাচীনতা সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই।

১১. বোলচালের ভাষারূপে স্বীকৃতি পেলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে হিন্দি অস্পৃশ্য

দিল্লী অঞ্চলের কথ্যভাষা (যাকে আমরা খড়িবোলি নামে অভিহিত করছি, যদিও নামটির সৃষ্টি অনেক পরবর্তী কালের) আরবি-ফারসির মিশ্রণে নতুন 'হিন্দি' নামে পরিচিত হলেও প্রথম-প্রথম দু-একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, কি মুসলমান কি হিন্দু, কোনো সম্প্রদায়ের হাতেই তার সাহিত্যিক ব্যবহার ঘটে নি। মুসলমানরা ব্যবহার করতেন ফারসি, হিন্দুদের মুখে ব্যবহৃত হত বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা। ক্রমে ব্রজভাষাই হল সাহিত্যের প্রধান বাহন। এমনকী মুসলমান কবিরাও ব্রজভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হতে থাকেন। আবদুর রহিম খানখানা ব্রজসাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি। সম্রাট আকবরও ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করেছেন বলে জানা যায়। অওধ অঞ্চলের মুসলমান কবিরা সূফী কাব্য লিখেছেন অওধি ভাষায়। এইভাবে একদিকে ফারসি, অন্যদিকে ব্রজভাষা-অওধির চাপে খড়িবোলি হিন্দি সাহিত্যিক মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়ে রইল।

১২. খড়িবোলি হিন্দির সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ দাক্ষিণাত্যে

উত্তর ভারতে যে গৌরব জোটে নি, খড়িবোলির সেই গৌরবলাভের সুযোগ ঘটল দাক্ষিণাত্যে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকে (আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্বকালে) মুসলমানদের আক্রমণ দাক্ষিণাত্যের দিকে পরিচালিত হয়। কিছুকাল পরে তুগলক বংশের খেয়ালি সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক দিল্লী থেকে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করে দিল্লীর বাসিন্দাদের জোর করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। আট বছর পরে সুলতানের মতিবুদ্ধি পালটালেও, দাক্ষিণাত্যে ধীরে-ধীরে মুসলমানদের একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে (১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সুলতানি বহমনি রাজ্য। পরবর্তী কালে এই বহমনি রাজ্য বিভক্ত হওয়াতে যে পাঁচটি রাজ্যের সৃষ্টি হল, তার মধ্যে বিজাপুর আর গোলকুণ্ডাই মুসলিম শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তখনকার গোলকুণ্ডার রাজধানী হায়দরাবাদে আজ পর্যন্ত সেই ধারা চলে এসেছে।

দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা দিল্লী থেকে আগত বলে তাঁদের মুখের ভাষা ছিল দিল্লী অঞ্চলের খড়িবোলি হিন্দি। ষোড়শ শতকের চতুর্থ পাদ থেকে এঁদের সাহিত্যরচনায় একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিল—ফারসির পরিবর্তে দিল্লীর কথ্যভাষাকেই এঁরা সাহিত্যচর্চার বাহন করে নিলেন। কিন্তু ফারসির প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠাও এঁদের পক্ষে সম্ভব হল না। এইভাবে খড়িবোলি হিন্দির সঙ্গে আরবি-ফারসির মিশ্রণে যে নতুন কাব্যভাষা জন্মলাভ করে, তার নাম হল "রেখতা" (অর্থাৎ মিশ্রভাষা)। কুতব-শাহি বংশের মুহম্মদ কুলী যিনি ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁকেই "রেখতা"-র প্রথম কবি বলে উল্লেখ করা হয়।

খড়িবোলি হিন্দিকে সাহিত্যে প্রয়োগের প্রথম কৃতিত্ব অবশ্যই দিল্লীবাসী অমীর খুসরোর (১২৫৩-১৩২৫)। মূলত ফারসির লেখক হলেও তিনিই খড়িবোলি হিন্দির প্রথম কবি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ত কবি কবিরদাসের রচনাতেও ভোজপুরী, অওধি প্রভৃতির সঙ্গে খড়িবোলির প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খড়িবোলি হিন্দিতে ধারাবাহিক রচনার সূত্রপাত ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে—দক্ষিণের মুসলমান কবিদের হাতে।

তখনও উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের বোলচালের ভাষা হিন্দি হলেও তাঁদের কাব্যরচনার ভাষা ছিল ফারসি। তাই তাঁরা দক্ষিণী মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার এই নতুন মিশ্রভাষা "রেখতা"কে দক্‌খিনি হিন্দি বা সংক্ষেপে দক্‌খিনি বা দখ্‌নি বলতে থাকেন। দখ্‌নির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে আরবি-ফারসির পরিমাণ ছিল অল্প। একশতাব্দীব্যাপী অনুশীলনের ফলে দখ্‌নি হিন্দির সাহিত্যিক রূপে একটা বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দেয় এবং সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হন রেখ্‌তা বা দখ্‌নি হিন্দির শ্রেষ্ঠ কবি ওয়লি ঔরঙ্গাবাদী (১৬৬৮-১৭৭৪)।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়লির ঔরঙ্গাবাদ থেকে দিল্লী আগমনের ফলে উত্তর ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। দিল্লী অঞ্চলের সাহিত্যচর্চায় ফারসির স্থানে ধীরে-ধীরে খড়িবোলি হিন্দিকে স্বীকার করা হতে থাকে।

১৩. অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে হিন্দুস্তানি বা উর্দু সাহিত্যের পরম্পরা

কিন্তু দক্ষিণী মুসলমান সাহিত্যিক ভাষা থেকে উত্তরী মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষায় বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা দেয়—তা হল আরবি-ফারসির মিশ্রণ। স্বয়ং ওয়লি ফারসির সূফী কবি শাহ সাহুল্লা গুলশনের পরামর্শে বোলচালের ভাষা ছেড়ে ফারসিময় হিন্দিতে কাব্যরচনা শুরু করেন। দক্ষিণী মুসলমানেরা নিজেদের

'দখ্‌নি' থেকে উত্তর ভারতের মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষার পার্থক্য বোঝাবার জন্য এর নামকরণ করেন উত্তর ভারতবা হিন্দুস্তানের ভাষা, অর্থাৎ হিন্দুস্তানি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি উত্তর ভারতে এই হিন্দুস্তানি নামটির প্রচলন হতে থাকে। ঔরঙ্গাবাদের ওয়লিকে রেখ্‌তার জনক না বলে এই হিন্দুস্তানির —যার পরিণত রূপ উর্দু—জনক বলাই সমীচীন। ওয়লির দিল্লী আগমনের পরে অষ্টাদশশতকের গোড়া থেকেই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানি বা উর্দুর সাহিত্যপরম্পরার সৃষ্টি। এইভাবে দিল্লী অঞ্চলের কথ্যভাষা খড়িবোলি হিন্দি নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে রেখতা, দখ্‌নি, হিন্দুস্তানি এবং পরিশেষে উর্দু নাম নিয়ে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৪. নবজাগ্রত এই হিন্দুস্তানি সম্পর্কে হিন্দু কবিদের ঔদাসীন্য

উত্তর ভারতের হিন্দুরা তখনও এই নবজাগ্রত ভাষা সম্পর্কে একরকম উদাসীনই ছিলেন বলা যায়। বোলচালের ভাষারূপে যথেষ্ট ব্যাপক এবং প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও খড়িবোলি হিন্দি যে হিন্দু কবিসমাজে ব্রজভাষার সম্মুখে সাহিত্যিক-গৌরবলাভে বঞ্চিত হয়ে রইল, তার প্রধান কারণ এই ভাষার সঙ্গে বিদেশী বিধর্মীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৈনন্দিন কথাবার্তায় এর ব্যবহার চলতে পারে, কিন্তু পবিত্র সাহিত্যিক ভাষা-রূপে নয়। তখনকার হিন্দুদের মনোভাব ছিল—ন বদেৎ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠ্যাগতৈরপি। যাবনী-ভাষা অর্থাৎ খড়িবোলি হিন্দি। কেশব, ভূষণ প্রভৃতি ব্রজভাষার কবিরা খড়িবোলি হিন্দির ব্যবহার করেছেন কেবল মুসলিম চরিত্রের মুখে।

১৫. হিন্দুদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও হিন্দুস্তানির প্রসার

কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলল না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে দিল্লীর পরিবর্তে লখনউ থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের শহরগুলির রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। ব্যবসায়ী ও সেনা-বাহিনীর সঙ্গে দিল্লীর ভাষা পূর্বাঞ্চলেও বিস্তারলাভ করে। খড়িবোলির ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য এবং প্রসারের ফলে এর প্রতি আর উদাসীন থাকা সম্ভব হল না। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে সমগ্র উত্তর ভারতের নাগরিক জীবনে খড়িবোলি দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করে। হাটে-বাজারে, বহির্জীবনের অন্যান্য কাজকর্মে বোল-চালের ভাষারূপে খড়িবোলির ব্যবহারই চলতে থাকে। এইভাবে ইংরেজ শাসনের সূচনাতে হিন্দি অঞ্চলের অন্যান্য ভাষা/উপভাষাগুলিকে পিছনে ফেলে খড়ি-বোলিই পুরোবর্তী হয়ে ওঠে। খড়িবোলি নামটির প্রচলনও এই সময়ে। ব্রজভাষা প্রভৃতির প্রভাব ক্ষয়িষ্ণু দেখে এগুলিকে বলা হয় 'পড়িবোলি' এবং দিল্লীর ভাষা হয়ে ওঠে 'খড়িবোলি'। বিস্তীর্ণ হিন্দি অঞ্চলের এই ঐক্যবিধায়ক ভাষা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের পূর্বেই তা হিন্দি জগতের লিঙগুয়া ফ্রাঙ্কা হয়ে দাঁড়ায়।

১৬. নাগরী লিপিতে হিন্দুস্তানি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি

অতঃপর সাহিত্যসৃষ্টিপর্ব। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে হিন্দি বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আগ্রানিবাসী গুজরাতি ব্রাহ্মণ লল্লুলালের "প্রেমসাগর" এবং বিহারের অধিবাসী অদল মিশ্রের "নামিকেতোপাখ্যান"। এর দু-এক বছর আগে মুনশী সদাসুখলাল এবং ইন্‌শা আল্লা খাঁ (জন্ম মুর্শিদাবাদে) রচিত দুখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের গদ্য বিশুদ্ধ খড়িবোলি। 'খড়িবোলি' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় লল্লুলালের "প্রেমসাগর" গ্রন্থে। মোট কথা, হিন্দুদের সাহিত্য-রচনায় ব্রজভাষার পরিবর্তে খড়িবোলি ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দি সাহিত্যে নবযুগের সম্ভাবনা দেখা

দিল।

১৭. হিন্দি সাহিত্যে গদ্য আর পদ্যের দ্বন্দ্ব

হিন্দি সাহিত্যে নবযুগ আরম্ভ হল বটে, কিন্তু ভাষার সমস্যা মিটল না। গদ্যে খড়িবোলির প্রতিষ্ঠা হলেও, পদ্যে তখনও ব্রজভাষার আধিপত্য। খড়িবোলির পক্ষে সেই অধিকার লাভ করা সম্ভব হল না। পদ্যের ভাষা সহজে পালটায় না। ব্রজভাষায় গদ্যের চর্চা হয়েছিল সামান্যই। তাই ইংরেজ আমলে হিন্দি গদ্যের জন্য যখন খড়িবোলি মনোনীত হল তখন কোনো দিক থেকেই আপত্তির কোনো কারণ দেখা যায় নি। এই জন্যই উনিশ শতকের গোড়ায় গদ্যের ক্ষেত্রে খড়ি-বোলির নির্বিরোধ প্রতিষ্ঠাকে হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্ল ভগবানের অনুগ্রহ বলে মনে করেছেন। এবং প্রায় একশ বছর (অর্থাৎ গোটা উনিশ শতক) হিন্দি সাহিত্যে দ্বৈতরাজ চলতে থাকে —গদ্যে খড়িবোলি, পদ্যে ব্রজভাষা।

১৮. হিন্দি-উর্দু কলহ

গদ্যপদ্যের ভাষা নিয়ে হিন্দির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলতে থাকার কালেই হিন্দিকে আর-একটি গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। তা হল হিন্দি-উর্দু কাজিয়া। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বের প্রশ্ন দেখা দেয় নি, কারণ তখনও হিন্দুদের সাহিত্যচর্চার বাহন ব্রজভাষা এবং তখনও মুসলমান কবিদের হাতে খড়িবোলি আরবি-ফারসি-কণ্টকিত হয়ে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে নি। উনিশ শতকের গোড়ায় খড়িবোলি হিন্দু জনসাধারণের সাহিত্যিক গদ্যভাষারূপে গৃহীত হলে এই দ্বন্দ্বের উদ্‌ভব ঘটে। অথচ দুটি ভাষারই মূলাধার দিল্লী-মেরঠ অঞ্চলের খড়িবোলি যাকে গ্রিয়ারসন সাহেব খুব ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলেছেন হিন্দুস্তানি।

সাধারণ বোলচালের হিন্দুস্তানিতে সংস্কৃত বা আরবি-ফারসির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প। মুসলমান-দের হাতে হিন্দুস্তানির মূল রূপটিই অল্পবিস্তর রক্ষিত হয়েছিল। ধীরে-ধীরে সেই সাহিত্যিক হিন্দুস্তানি মুসলমানি রূপ নিয়ে জবান্-এ-উর্দু নাম গ্রহণ করে। আবার সেই হিন্দুস্তানি বা ঠেঠ-হিন্দি হিন্দুদের হাতে সংস্কৃতময় রূপ নিয়ে হিন্দি নামে পরিচিত হতে থাকে। এইভাবে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে একই ভাষা দুই ভিন্ন সাহিত্যিক-রূপে (হিন্দি ও উর্দু) দুই ভিন্ন লিপিতে (নাগরী ও ফারসি) মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হতে আরম্ভ করে। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে যেমন পারিবারিক সমস্যার সমাধান ঘটায়, হিন্দি-উর্দুর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল।

১৯. লিপি ও শব্দসম্ভারের জন্য জাতি-সম্পর্কিত দুটি ভাষা পৃথক হয়ে গেল

খড়িবোলি হিন্দির বা ঠেঠ-হিন্দির বা হিন্দুস্তানির একটি সাহিত্যিক রূপ হিন্দি আর আরেক সাহিত্যিক রূপ উর্দু। সুতরাং জন্মের দিক থেকে বলা যায়—এরা দুই সহোদরা। হিন্দি-উর্দুকে দুটি ভিন্ন ভাষা না বলে একই ভাষার দুই স্বতন্ত্র রচনাশৈলী বলে মনে করে কেউ-কেউ তৃপ্তিবোধ করেন। বস্তুত এক সময় ছিল যখন হিন্দুস্তানিকে হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত ভাষারূপে গ্রহণ করা সম্ভব হত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উর্দু আরবি-ফারসির ছায়া হয়ে পড়ে। সিপাই বিদ্রোহের পরে হিন্দি-উর্দুর ব্যবধান আরও বেড়ে যায়। আজ এদের রূপগত পার্থক্য এত বেশি যে এই দুটিকে স্বতন্ত্র ভাষা বলে মনে করাই সমীচীন। আজ আর কোনোমতেই প্রসাদ আর পন্তের ভাষাকে গালিব আর ইকবালের ভাষার সঙ্গে এক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয়। তবে উর্দু লেখকদের বড়ো কৃতিত্ব এই যে, তাঁরাই সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানি বা ঠেঠ হিন্দি বা খড়িবোলি হিন্দিকে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন। লিপি যাই হোক, খড়িবোলি হিন্দি বা হিন্দুস্তানি অদ্ভুত শক্তি-শালিনী ভাষা। অনেক সংঘর্ষ ও বাদবিবাদের পরে এর প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই

নবীন ভাষা নাগরী আর ফারসি লিপিকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের প্রধান অংশের সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাষারূপে দাঁড়িয়ে গেল। ১৯১৭ সাল থেকে তিরিশ বছর ধরে গান্ধীজী এই দুটি ভাষার মিলনযজ্ঞের জন্য অক্লান্তচিত্তে যে মন্ত্র আবৃত্তি করেছিলেন, আজ না হোক একদিন হয়তো সেই মন্ত্র ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দেবে।

[পাঠকের প্রতি নিবেদন : যে-সকল পাঠক এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অপূর্ণতায় অতৃপ্তি বোধ করবেন, তাঁরা যেন "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"র বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ১ এবং ২ থেকে বর্তমান নিবন্ধকারের টীকাটিপ্পনী ও গ্রন্থপঞ্জী সমেত ২৮ পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়ে দেখেন। বর্তমান নিবন্ধটি উক্ত প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করেই লেখা। —বিনীত লেখক]

ছবি

সুরজিৎ ঘোষ

মৃদু সুগন্ধের মতো ভেসে আসছে চুলের গোছা
শাদা খোলের শাড়ি, অস্পষ্ট হলুদ-লাগা হাত।
বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে কুসুম
মা নেই, এখানে তার মা নেই, এখন অনেক বেশি রাত।

বৃষ্টি থেমে গেছে, চৈত্রের আমপাতা ঠিক ডোঙার মতো
টুপটুপ করে জল ঝরাচ্ছে ষোলো বছরের উপর
কুসুমের নবীন প্রেমিক টুপু বড়ো রাশভারি সেজেছে
গম্ভীর বাবার মতো, মুখে বই, কথা নেই সমস্ত দুপুর।

আয়েষা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আয়েষার কথা আমি লিখতে চাই কয়েকটি কথায়।

ফর্শা রোগা লম্বাটে মুখের প্রান্তে কাঁচাপাকা চুল,
কবিতায় পোড়া চোখ, ঈষৎ সন্দিগ্ধ, খালি হাত,
নাকে কানে লাউফুলের মতো শুভ্র অলংকার
উজ্জ্বল তুচ্ছতা।
আকালপুরের কাছে স্কুল শিক্ষয়িত্রী, এ বছর
কবিসম্মেলন ছিল ওই গ্রামে। আমি লক্ষ করি
এই মেয়ে অন্য আয়েষার মতো ততো তেজি নয়।

একটু দূরে বাংলাদেশ। আয়েষা কি ওদেশের মেয়ে?
ওর দুটি কন্যা, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, ওরা দিল মালা।
কোথায় ওদের আব্বা? জিজ্ঞেস করি নি, শুধু
লক্ষ করে গেছি
আয়েষার ওই শীর্ণ দেহটি নাকাল কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত নয়—
স্কুল থেকে বাড়ি, থেকে স্কুল
নিজের মাচাটি ঘিরে লতিয়ে রয়েছে।
লোকে ডাকে আয়েষা বহিন :
অত কাছ থেকে কোনো মুসলিম মহিলা আগে দেখিনি কখনো।

বিকেলের রোদে
ওদের খড়ের চালে ছড়িয়ে রয়েছে লাউলতা
আয়েষা দেখালো :
নিজস্ব আকার নিয়ে একেকটি নিটোল লাউ শুয়ে আছে,
'সন্তানের মতো—তাই নয়?'
আমি ঠিক মেলাতে পারি না, তবু
মনে হয়, ও-ই জানে বেশি
লাউপাতার মতো ওর মসৃণ হাতের পাতা শুকিয়ে এসেছে
আঙুলের গাঁটে সরু ডাঁটাগুলি, লাউডাঁটা
টিঁকে আছে তবু
এই দেশে, লাউজননীর পাশাপাশি।

নগ্ননারী, তোমার সম্মুখে শুধু নতজানু হব

মঞ্জুভাষ মিত্র

তোমার সম্মুখে শুধু নতজানু হব নগ্ননারী, তুমি প্রাচুর্যমণ্ডিত
এক শ্রেষ্ঠ ফলের উদ্যান অথবা সুন্দর তুমি ভারতীয় শীত
আলোঝলমলে, খুব বেশি ঠাণ্ডা কিংবা গরমের আতিশয্যহীন
তোমার বসার ঘরে লঘুপায়ে আসে যায় ঋতুফুল, ছবি ও সংগীত
আমার বুকের ভিতর সযত্নে লুকিয়ে রাখ তুমি প্রিয়যৌবনের দিন
আমি ভুল পথে চলে গেলে এসেছিলে মৃত্যুর মতন গাঢ় ঘুমে
আতঙ্কের ভিতর দেখিয়েছ উজ্জ্বল স্বদেশ সৎপথে ফিরাবে ব'লে
শিল্পের বান্ধবী তুমি পৃথিবীর বিখ্যাত অসতী যুবতীগণের
সঙ্গে তুলনীয়া; তোমার বসার ঘরে আসে যায় আমার সঙ্কল্প
অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো একনিষ্ঠ দুরূহ প্রতিজ্ঞা
মনে পড়ে তোমার দুর্লভ উরু সু-বর্ণ অর্কিড বুকে জড়িয়ে ধরেছি
একদিন জানালার ধারে; কোনো অতন্দ্র যোদ্ধার মতো বীর সাহসিক
ভাবনার মৌমাছি-দংশনে ব্যাকুল অধীর হয়ে ঠোঁট নামিয়েছি
রাতের বাগানে; সুখের দ্রাক্ষাবনে আমি আত্মমগ্ন তন্নিষ্ঠ পথিক
কাব্য আলোচনা করি সর্বদা তোমার সঙ্গে হে সু-স্তনী গুরু-নিতম্বিনী
আমি বিখ্যাত দেবতা কিংবা ঈর্ষাতুরা অন্য দেবীদের বন্দনা করি নি
শুধু তোমার সম্মুখে নতজানু হব বলে অনায়াস প্রতিজ্ঞা করেছি
অনন্তের কাছে যাবো বৃক্ষের কাছে যাবো : এই দুই আমাকে
একমাত্র তুমি দিতে পারো···

বিচারের কাঠগড়ায় শনাক্ত করে

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকটা রক্ত দিয়ে দিয়েই শেষ হয়ে গেল
রক্তের জোগান আর হল না দেহে।
ঈশ্বরবাদীরা বলে : এটা একেবারে ভগবানের মার
ভাগ্যবিশ্বাসীদের মতে : এটা পোড়া কপালের দোষ
যুক্তিবাদীরা জানায় : লোকটা আহাম্মক
ঘুরে দাঁড়াতে পারে নি।

লোকটার প্রেতাত্মা তখন বীভৎস তাকায়
ধারালো ছুরির মতন হাসে
সাঁড়াশি-আঙুল তোলে আমাদের দিকে···
বিচারের কাঠগড়ায় যেন শনাক্ত করে।

সংস্কৃত ভাষা প্রসঙ্গে

সংস্কৃত ভাষা কি মৃত ?

মনসুর মুসা

'সংস্কৃত একটি মৃতভাষা'—এই ধারণা এখন বহুল প্রচলিত। এই ভাষাটির প্রতি এদেশের শিক্ষিত মানুষের আকর্ষণ কমে গেছে মনে হয়। সেজন্য তাঁদের মধ্যে এ ভাষা-চর্চার প্রতি অনীহা প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই অনীহা পৃথিবীর সর্বত্র নয়, ভারতবর্ষে—যেখানে সংস্কৃত ভাষার জন্ম আর বিকাশ ঘটেছে সেখানে। ভারতরাষ্ট্রে সংস্কৃতচর্চা কিঞ্চিৎ উজ্জীবিত হলেও পাকিস্তানে আর বাংলাদেশে এর চর্চা মোটেই হচ্ছে না। অথচ পাকিস্তানের পানজাব অঞ্চলই ভাষাটির বিকাশক্ষেত্র। সংস্কৃত ভাষার চর্চা হ্রাস পেতে থাকে মুসলমান রাজত্বের শেষ দিকে। ষোড়শ শতকের বাঙলায় সংস্কৃতচর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল নদীয়ায়, শ্রীহট্টে, ঢাকায় আর চট্টগ্রামে। কিন্তু পরবর্তী কালে সংস্কৃতচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশ্বের জ্ঞানী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্যার উইলিয়ম জোনস আজকে থেকে দু-শ বছর আগে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত এক ভাষণে। তিনি বলেন—

> সংস্কৃত ভাষা, তার পুরাবৃত্ত যাই হোক না কেন, একটি আশ্চর্যজনক সংগঠনের অধিকারী; গ্রীকের চেয়ে পূর্ণ, ল্যাটিনের চেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ, এর দুটোর চেয়ে অধিকতর চমৎকারভাবে সুসংস্কৃত, অথচ ও দুটোর সঙ্গেই তার বেশ মিল, ক্রিয়ামূল ও ব্যাকরণ রূপ উভয়েই,—যা নেহাত আকস্মিকভাবে হয়েছে বলে সম্ভবত ধরা যাবে না। এ মিল এত প্রকট যে কোন ভাষাতাত্ত্বিকই তাদের সমউৎসজাত, অথচ বর্তমানে অনস্তিত্বসম্পন্ন কোনো ভাষা থেকে উৎপন্ন এ ধারণা না করে পারবেন না।

উইলিয়ম জোনসের এই ভাষণ পরবর্তী শতকে ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিকাশসাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আর তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ-সূত্র হল সংস্কৃত ভাষা। 'সংস্কৃত ভাষা মৃত'—এ ধারণা সর্বৈব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংস্কৃত এখনও সমগ্র হিন্দুসভ্যতার চিৎপ্রকর্ষের আধার, সমস্ত হিন্দু পূজাপার্বণের ব্যবহারিক ধর্ম-

ভাষা। ভারতীয় লোকগণনার তথ্য থেকেও দেখা যায়, ভারতে কয়েক শ লোক নিজেদের সংস্কৃতভাষী বলে দাবি করেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশেও সংস্কৃতচর্চা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। এখনও টোল-চতুষ্পাঠীর মৃদু আলোকে সংস্কৃত পঠিত এবং অনুশীলিত হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার অবস্থা এতটা করুণ হয়ে উঠত না যদি এ ভাষা ব্রাহ্মণ্যের রক্ষণশীল বদ্ধমুষ্টি থেকে মুক্তি পেত। অনেকেরই মনে আছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলেন, ভরতি হয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-শিক্ষকের অসহযোগিতার কারণে তিনি সংস্কৃত ছেড়ে ভাষাতত্ত্বে ভরতি হতে বাধ্য হন। সেদিন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত পড়তে পারলে সংস্কৃতের প্রতি মুসলমানদের মনোভঙ্গিতে বড়ো রকমের পরিবর্তন হত। সেটা হয়তো সংস্কৃত ভাষা প্রসারের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারত। ভাষা বেঁচে থাকে অনুশীলনকারীর অভ্যাসের মধ্যে; সে-কারণে ভাষা-প্রসারে বাধা সৃষ্টি হলে ভাষা নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্র সীমিত। যেহেতু হিন্দুধর্মের পাঠ্যসূচীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সে কারণে অনেক মুসলমান ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করতে পারে না। এই অবস্থার অবসান হওয়া উচিত। কারণ সংস্কৃত এখন আর শুধু ব্রাহ্মণের ভাষা নয়, এক ধরনের আন্তর্জাতিক জ্ঞানচর্চার ভাষা। এ-ভাষার অনুশীলন এখন চলছে যুক্তরাজ্যে, যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েত ইউনিয়নে, জার্মানিতে, ফরাসি দেশে, অস্ট্রেলিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, আরো অনেক দেশে। মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাস যিনিই অধ্যয়ন করবেন, যিনিই সভ্যতার বিকাশে মৌখিকতা থেকে লৈখিকতায় উত্তরণের তত্ত্ব জানতে চাইবেন, তাঁকেই সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত ছুটো মহাকাব্য রামায়ণ আর মহাভারতে চোখ ফেরাতে হবে, জানতে হবে চতুর্বেদের জন্মকথা। সংস্কৃত ভাষা এখন আর ব্রাহ্মণের সম্পদ নয়, সমগ্র মানবসমাজের সাধারণ সম্পদ। বাংলাদেশ এ সম্পদের গর্বিত উত্তরাধিকারী হতে পারে। একথা জানা গেছে যে বাংলাদেশে এখন টোল, চতুষ্পাঠী আর সংস্কৃত কলেজের সংখ্যা ১১১; ছাত্রসংখ্যা ৩১০৫; আর শিক্ষক-সংখ্যা ৩৭৫। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—এসব বিদ্যায়তনের সংস্কৃত শিক্ষা কতটা আধুনিক-যুগোপযোগী। সংস্কৃতের উত্তরাধিকারের গর্বিত অংশীদার হতে হলে সংস্কৃত শিক্ষাকে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে অধ্যয়ন করতে হবে।

সংস্কৃতজাত ভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষা স্বীকৃত হলেও বাঙলা ভাষা আর সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক সুনির্ধারিত ছিল না। বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃত প্রবক্তাদের মনোভঙ্গিই এর অন্যতম কারণ। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন—

> একদিন ছিল যখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাংলাভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের বিরোধ ছিল। এর প্রতি কিছু অবজ্ঞাও তখন করা হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃতের আলয় থেকে বাংলা তখন যথোচিত সম্মান পায় নি তার কারণও হয়তো ছিল। তখন বাংলা ছিল অপরিণত, সাহিত্যের অনুপযোগী।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার শক্তির উৎস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—

> কিন্তু যে শক্তি তখন এর বাঙলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি এ কোথা থেকে পেয়েছে? সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে। সেই কারণেই তার পরিণতিও চলেছে, কোথাও বাধা পায় নি। বাইরে থেকে যে-সকল বিদ্যা আমরা লাভ করেছি, তা আমাদের ভাষায় রক্ষা সম্ভব হল, কারণ বাংলার দৈন্য ও অভাব আজ আর বেশি নেই। পাশ্চিভাষিক কিছু দারিদ্র্য আছে বটে, কিন্তু সে দারিদ্র্য পূর্ণ করবার উপায় আছে সংস্কৃতের মধ্যে।

বাঙলা নামের যে ভাষার কথা আমরা জানি তার শতকরা ৬০ ভাগ শব্দ নাকি সংস্কৃত থেকে এসেছে। এই কথার একটি ব্যাপক তাৎপর্য আছে। সেটা হচ্ছে বাঙলা ভাষা যখন নতুন

প্রয়োজনে নতুন শব্দ সৃষ্টি করার প্রয়াস পাবে, তখন এই ৬০ ভাগ শব্দের ওপর তাকে নির্ভর করতে হবে। অর্থাৎ বাঙলা শব্দসম্পদ-সৃষ্টির প্রধানতম উৎস হচ্ছে সংস্কৃত শব্দমূল। তাই সংস্কৃত ভাষা ও বাঙলা ভাষার মধ্যে ভিন্নতার দেওয়াল তুলতে যাওয়ার মানে হবে শব্দসম্পদ-সৃষ্টির এই স্বাভাবিক উৎসকে অস্বীকার করা। এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ভাষাগত আত্মঘাতকর্ম। আজকে যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে বাঙলা আর সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সাধারণ সম্পদ কী? এ সম্পদের পরিমাণ কত? বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতের মধ্যে ভিন্নতাসূচক উপাদানগুলো কী কী? এ ভিন্নতা বাঙলা ভাষার জন্য কী তাৎপর্য বহন করে? প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষার বহু সমস্যা আছে যেগুলো সংস্কৃত ও বাঙলার মিল-গরমিল উপলব্ধির গভীরতার অভাব থেকে জাত। সন্ধির নিয়ম, সমাসের সংখ্যা, ণত্ব- ও ষত্ব -বিধানের উপযোগিতা ইত্যাদি সমস্যা এসেছে বাঙলা আর সংস্কৃতের মধ্যে গড়ে ওঠা ভিন্নতার পরিমাপ করার অক্ষমতা থেকে। আমাদের সমকালীন ভাষা-বোধ নানা কারণে অত্যন্ত হালকা হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য:

> একদিন ছিল ভারতবর্ষে ভাষা-বোধের একটা প্রতিভা। ভারতবর্ষ পাণিনির জন্মভূমি। তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। অথচ প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে লুপ্তপ্রায় করেন নি। তার কারণ ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সহজ বোধ-শক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ফেলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই শব্দসম্পদ পাবে কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অসংগত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনো সে চেষ্টা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গভীরভাবে সমকালীন অসঙ্গত ভাষা মনোভঙ্গি (abnormal language attitude) গড়ে ওঠার কারণটি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন:

> যাঁরা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের।

রবীন্দ্রনাথের এ পর্যবেক্ষণ যে কতটা খাঁটি সেটা বোঝা যায় গত দুশ বছর ধরে ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনো-ভঙ্গি গঠনে পাশ্চাত্য বিদ্বানদের প্রভাবের ইতিহাস অনুধাবন করলে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পর্যবেক্ষণ আমাদের মনো-ভঙ্গিকে বিসর্পিল করে তুলেছিল যাতে করে আমরা ভিন্নতার দেওয়াল তুলেছিলাম বাঙলা আর সংস্কৃতের মধ্যে। আমাদের চেতনায় সৃষ্টি হয়েছিল বর্জনশীল প্রবণতা। ফলে সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্পদকে আমরা বোঝার পাহাড় মনে করেছিলাম। নতুন ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদ এসব বাধার পাহাড় অতিক্রমণে আমাদের সহায়তা করছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা অধুনা তরঙ্গমতবাদ বা ওয়েভ থিয়োরি বলে একটি ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। এতে ভাষাপ্রসারকে তরঙ্গের মতো অবয়ব-কাঠামোয় উপলব্ধি করা হয়। এই মতবাদ স্বীকার করলে বলতে হয়, ভারতীয় ভাষার বিকাশে সংস্কৃত ভাষা একটি তরঙ্গ, প্রাকৃত ভাষা আরেকটি তরঙ্গ, পালি ভাষা আরেকটি তরঙ্গ, অপভ্রংশ আরেকটি তরঙ্গ, অবহট্ট আরেকটি তরঙ্গ। সে অনুযায়ী বাঙলা ভাষা ভারতীয় ভাষাসমুদ্রের একটি তরঙ্গ মাত্র। সুতরাং তরঙ্গকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার যে বিপদ, বাঙলাকে ভারতীয় ভাষাস্রোতের মধ্য থেকে আলাদা করে দেখারও তেমনি বিপদ। এ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে আমাদের ভাষা মনোভঙ্গিতে বা language attitude-এ পরিবর্তন আনতে হবে।

বহুবিধ কারণে সংস্কৃত অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। আমি নিজে সংস্কৃত জানার সুযোগ পাই নি, তবুও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে গিয়ে, বিশেষ করে বাঙলা ভাষাতত্ত্বের চর্চা করতে গিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়নের যে প্রয়োজন উপলব্ধি করেছি তা সংক্ষেপে উল্লেখ

করছি—

বাঙলা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাত্রা যোগ করতে চাইলে অবশ্যই সংস্কৃত জ্ঞান অপরিহার্য মনে হয়। কারণ সংস্কৃতের যে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি -পদ্ধতি তাই বাঙলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি -পদ্ধতির মূল ছক। মূল ছক বা বিন্যাসের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে সেটি জানতে পারলে বাঙলার ঐতিহাসিক ধ্বনিতত্ত্ব-নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে ইন্দোইউরোপীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করে। উল্লেখিত সংস্কৃত ধ্বনিমূলবিন্যাস তখনই স্থিরীকৃত হয়েছিল। তারপর গত তিন হাজার বছরে সেই ধ্বনিমূল ছকে নানাবিধ পরিবর্তন হয়েছে। সে পরিবর্তনের উপাদানগুলো বাদ দিলে বাকি সব ধ্বনিমূলই সংস্কৃত-বাঙলার যৌথ সম্পদ।

ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্র ছাড়াও, রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে সংস্কৃতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নি এমন যেসব রূপমূল বাঙলায় এসেছে সেগুলো সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোনো ভাষা-গোষ্ঠী থেকে এসেছে। বাঙলা ভাষাকে অনেকেই সঙ্কর ভাষা বলে থাকেন। এই সাঙ্কর্য কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কোন্ কোন্ উপাদানের সাঙ্কর্যে বর্তমান বাঙলা ভাষা গঠিত হয়েছে তা জানতে হলে সংস্কৃত উপাদান-গুলোকে পৃথক করে নিয়ে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

অনেকেই বলছেন, সংস্কৃত ব্যতিরেকে অন্যান্য উপাদানের ইতিহাসেই বাঙলা ভাষার প্রকৃত ইতিহাস নিহিত রয়েছে। একথা অর্ধসত্য। কারণ বাঙলা ভাষার অবয়বগঠনে সংস্কৃতের দান যতটুকু হবে অন্যান্য ভাষার ততটুকু হবে কিনা বলা মুশকিল। বাঙলা ভাষার বাক্যে যে নমনীয়তা অর্থাৎ পদক্রমের স্থানবদলের শক্তির প্রাচুর্য সংস্কৃতের কাছ থেকে পাওয়া, কিংবা অন্য কোন উৎস থেকে পাওয়া তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। বোঝা যাচ্ছে, বাঙলা ভাষার স্বরূপসন্ধান করতে হলে সংস্কৃতের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। বাঙালির সংস্কৃতচর্চায় এর চেয়ে বড়ো প্রয়োজন আর কী হতে পারে।

এসব ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজন ছাড়াও প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করতে হলে সংস্কৃতের পথ ভিন্ন অন্য কোনো সহজ পথ নেই। ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, বহু জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার সদর রাস্তা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান। সুতরাং সংস্কৃত ভাষাকে হিন্দু-ধর্মের কানাগলি থেকে মুক্তিদান করে মানবীয় জ্ঞানের উন্মুক্ত অঙ্গনে এনে অনুশীলন করা আজকের বিদ্বানদের একান্ত কর্তব্য।

তদুপরি ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের যে বৈদগ্ধ্য সেটা চিরদিন সাহিত্যপ্রাণ মানুষকে আনন্দ দান করবে। সেকারণে সংস্কৃত ভাষা চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। তাই বলছিলাম—'সংস্কৃত একটি মৃত ভাষা'—এ মনো-ভঙ্গিতে পরিবর্তন আসা প্রয়োজন।

---

* আলোচনাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানব-বিদ্যাকেন্দ্র আয়োজিত 'বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা' বিষয়ক সেমিনারে পঠিত হয় ২৭. ৯. ৮৭ তারিখে।

সংস্কৃত শিক্ষার হাল-হকিকত

প্রদীপকুমার মজুমদার

বর্তমানে আমরা শিক্ষাজগতের নানা সমস্যা নিয়ে বিব্রত। মাধ্যমিক আর উচ্চ-মাধ্যমিকের ফল বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই কলেজে আর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভরতির ভিড়। ভিড় যদিও প্রধানত বিজ্ঞানশাখায় ভরতির জন্যই বেশি, কিন্তু কোনো-কোনো বিষয়ে কলাশাখায় ভরতির ভিড়ও কম নয়। অনেক কলেজেই স্নাতকস্তরে অনার্সে ভরতির জন্য ভরতি-পরীক্ষা চালু, কোথাও বা ভরতি মেধা-ভিত্তিক। কিন্তু এমন একটি বিষয়ের পঠনপাঠন স্কুলে কলেজে এখনও কোনো-রকমে টিকে আছে যার অধ্যাপককুল ছাত্রের আশায় বছরের পর বছর তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন, কিন্তু ছাত্রের দেখা নেই।

বিষয়টি সংস্কৃত। কলাবিভাগে যেখানে ইংরাজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে একটু নামজাদা কলেজে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের সবাই অনার্স নিয়ে ভরতি হতে পারছে না, সেখানে সংস্কৃতে সুযোগ পেলেও ভরতি হতে কেউ একেবারেই ইচ্ছুক নয়। এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী অবুদ্ধিজীবী সবাই ঝটিতি মত প্রকাশ করেন: সংস্কৃতের ডিমানড নেই। চাহিদা-জোগানের চিরন্তন নিয়ম মেনে তাই নতুন কোনো সরকারি আর বে-সরকারি কলেজে 'সংস্কৃত' খোলা হচ্ছে না। অবসরপ্রাপ্ত সংস্কৃত-অধ্যাপকের জায়গায় নতুন কোনো অধ্যাপকও নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না। পি.এস.সি. ১৯৮০ সালের পর সরকারি কলেজে সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদের জন্য কোনো বিজ্ঞাপন দেন নি। সি.এস.সি. ১৯৮০ সালের পর আর-একবার মাত্র বে-সরকারি কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপকের প্যানেল তৈরির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কারণ, সুস্পষ্ট।

কলেজে-কলেজে যুবক, প্রৌঢ় এবং প্রায়-বৃদ্ধ সংস্কৃত-অধ্যাপকের দল অবসরের পূর্বেই অনিচ্ছাকৃত সবেতন অবসরজীবন যাপনের দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। গত জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্ত্রী সরকারি কলেজসমূহে একটি সারকুলার পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন—প্রতি ক্লাসে সংস্কৃতের ছাত্র-

সংখ্যা কত, অধ্যাপকের সংখ্যাই বা কত! শিক্ষা-বিভাগের এটি জানতে চাওয়ার কারণ—অডিট আর অ্যাকাউনটস বিভাগ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, কর্মহীন বা প্রায়-কর্মহীন সংস্কৃত-অধ্যাপকদের বেতনের যোগান দিতে গিয়ে রাজকোষের অপচয় হচ্ছে। বেচারা সংস্কৃত-শিক্ষকরা নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন মনে করে কোথাও-কোথাও যেন-তেন-প্রকারেণ ছাত্র জোগাড়ের চেষ্টা করছেন। কিন্তু এভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কেনই বা এ পরিস্থিতির উদ্‌ভব হল, তা তলিয়ে দেখা দরকার। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বিষয়টিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নেব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে সংস্কৃত

গত চার-পাঁচ দশকে মাধ্যমিক পাঠক্রম বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। এনট্রান্স, ম্যাট্রিকুলেশন, স্কুল ফাইনাল (এস. এফ.), হায়ার সেকেনডারি (১১ বছরের এইচ.এস.), তারপর এখনকার সেকেনডারি বা মাধ্যমিক। এনট্রান্স থেকে এস. এফ. পর্যন্ত সংস্কৃত ছিল একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়, আর এর জন্য মার্ক বরাদ্দ ছিল ১০০। এগারো বছরের এইচ. এস. পাঠক্রম নবম শ্রেণী থেকেই কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় বিভক্ত ছিল। এই পাঠক্রমে ১৯৬৩ থেকে কলাশাখায় সংস্কৃত ছিল অবশ্যপাঠ্য, এবং ইংরাজি, বাঙলা আর সংস্কৃত মিলিয়ে ১০০০-এর মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যে ছিল ছয়টি পত্র (৬০০)। বিজ্ঞানবিভাগের ছাত্রদের অষ্টম শ্রেণীর পর মোটেই সংস্কৃত পড়তে হত না। ইংরাজি, বাঙলা, গণিত আর কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ই কেবল পড়তে হত। একসময় এ পাঠক্রম অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় এল বর্তমানের 'মাধ্যমিক'। এতে প্রথম কয়েক বছর সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালে যারা নবম শ্রেণীতে ওঠে, তাদের সময় থেকেই সংস্কৃত একটি "অতিরিক্ত ঐচ্ছিক" বিষয়-রূপে গণ্য হতে থাকে। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে অবশ্য সংস্কৃত (বিকল্পে হিন্দি/আরবি/ফারসি) থেকে যায়। সংস্কৃত যে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহে (যার মধ্যে একটি নিতে হবে, না নিলেও ক্ষতি নেই) অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলি হল: গণিত, পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, সংগীত, হিসাবশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, আরবি, ফারসি, ফরাসি, সংস্কৃত। স্বভাবতই সংস্কৃতের পঠনপাঠন হল খুবই সঙ্কুচিত।

নতুন মাধ্যমিক পাঠক্রমে (১৯৭৯-র পর) চালু হল গ্রুপ-প্রথা। এরকম চারটি গ্রুপ বা বিভাগ হল: কর্মশিক্ষা, ভাষা, বিজ্ঞান এবং ভারত ও তার অধিবাসী। ভাষা-বিভাগে রইল মাতৃভাষা (২০০) ও ইংরাজি (১০০)। বিজ্ঞানবিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান আর গণিত মিলে (১০০+১০০+১০০) বিজ্ঞান-বিভাগ হল। 'ভারত ও তার অধিবাসী' এই বিভাগে রইল ইতিহাস আর ভূগোল (১০০+১০০)। শারীরশিক্ষা, সমাজসেবা আর কর্মশিক্ষা (!) নিয়ে নতুন বিষয় 'কর্মশিক্ষা' (১০০)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন, জীবনবিজ্ঞানে প্রাণিবিদ্যা এবং উদ্ভিদ-বিদ্যা, আর গণিতে যুক্ত হল পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতি। এরপর আসছে 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ'—যাদের মধ্যে চারটিই বিজ্ঞান-বিষয়ক। নতুন পাঠক্রমে যে ছাত্র একাধারে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা গণিত পড়ছে, তার পক্ষে 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়' হিসাবে (অতিরিক্ত) গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, বলবিদ্যা (মেকানিক্‌স্) ও জীবনবিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোনো একটিকেই 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক' হিসেবে নেওয়া স্বাভাবিক, সুবিধাজনক। স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী তর্কবিদ্যা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সঙ্গীত বা হিসাব-শাস্ত্র নিয়ে থাকে। কাজেই মাধ্যমিকে 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক' বিষয় নিয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকেই চারটি বিজ্ঞান-বিষয় পড়তে হচ্ছে। অন্যদিকে ভাষাবিভাগ বাদ দিলে কলা-বিভাগের মাত্র দুইটি বিষয় একজন ছাত্রকে পড়তে হচ্ছে: ইতিহাস আর ভূগোল। এর মধ্যে আবার স্নাতকস্তরে 'ভূগোল' বিজ্ঞান-বিষয় বলেও গণ্য হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কি প্রাকৃতিক ভূগোল, কি অর্থনৈতিক ভূগোল—কোনোটাই 'মানবিকী বিদ্যা' বলে অভিহিত হতে পারে না। তাহলে মানবিকী বিদ্যা বলতে রইল বাকি 'ইতিহাস'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম এমনভাবে রচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠে। তারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাঠগ্রহণ করে দেশের অগ্রগতির শরিক হতে পারে। এবার দেখা যাক, কার্যক্ষেত্রে কী হচ্ছে?

মাধ্যমিকে অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্নের জন্য এবং বিজ্ঞান-বিষয়ে বেশি মার্কস তোলার জন্য যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক 'তারকা'-রূপে চিহ্নিত হয় বা উচ্চ প্রথম বিভাগ পায়, তাদের শতকরা ৮০-৯০ জনই বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়তে আসে, আর এদের মূল লক্ষ্য জয়েনট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসা। বর্তমানে মাধ্যমিকের পাঠক্রম উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ারই প্রবোচক।

উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানী আর কারিগরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু মানবিকী বিদ্যার এমন সামগ্রিক অবনয়নে শিক্ষাক্ষেত্রের ভারসাম্য ইতো-মধ্যেই বিনষ্টপ্রায়। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে স্কুলে কলেজে পড়ার জন্য যত ভিড়, কলা-বিষয় নিয়ে পড়ার জন্য একেবারেই তা নয়। নিয়মমাফিক উচ্চ-মাধ্যমিকে সংস্কৃত একটি ঐচ্ছিক বিষয়। উচ্চমাধ্যমিক কলা-শাখায় অবশ্যপাঠ্য ইংরাজি-বাঙলা বাদে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় তা হল: *রাষ্ট্রবিজ্ঞান, *অর্থনীতি, *ইতিহাস, *দর্শন, *আর্থনীতিক ভূগোল, ভূগোল (সব জায়গায় নেই), শিক্ষা (সব জায়গায় নেই), গার্হস্থ্যবিদ্যা, পুষ্টি (খুব কম জায়গায় আছে), সংস্কৃত/আরবি/ফারসি। উচ্চমাধ্যমিকে অবশ্যপাঠ্য ইংরাজি ও বাঙলা বাদে তিনটি বিষয় অবশ্যই নিতে হবে; আর একটি 'চতুর্থ বিষয়' হিসেবে নেওয়া যেতে পারে যা ডিভিসন তোলার পক্ষে সহায়ক। সাধারণত তারকাচিহ্নিত বিষয়গুলোর মধ্যেই ঐচ্ছিক বিষয়-গুলো ঠিক হয়ে যায়। এত বিষয়ের ভিড় কাটিয়ে সংস্কৃতের মতো একটি অ-অর্থকরী (না কি অনর্থকারী!) বিষয়ের সাধ্য কি সে পড়ুয়াদের মনোযোগ আকর্ষণ করে!

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাস 'ছাত্রপ্রিয়' বিষয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান তো অবশ্যপাঠ্য, ইতিহাসও প্রায় তাই এত ছাত্র এই দুই বিষয়ে পরীক্ষা দেয় যে তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্বল্পসময়ে পরীক্ষকদের প্রচুর খাতা দেখতে হয়। অন্যদিকে সংস্কৃতে সাকল্যে ১০০০-র বেশি ছাত্র কোনোমতেই হয় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা, অর্থনীতি—এ-সমস্ত বিষয় মাধ্যমিক স্তরে পড়ানো না হলেও, উচ্চমাধ্যমিকে এসব বিষয় ছাত্রদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু সংস্কৃতের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। সংস্কৃতকে 'তৃতীয় ভাষা'-রূপে গণ্য করা হয়। এখন কোনো একটি 'ভাষা' নবম-দশম শ্রেণীতে না পড়ে, উচ্চ মাধ্যমিকে এসে পড়া বেশ অসুবিধাজনক। অতএব, সংস্কৃত বাদ এখানেও। নীচে কলকাতার কয়েকটি নামী স্কুলের মাধ্যমিক আর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃতের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা দেওয়া হল (১৯৮৮-৮৯):

	মাধ্যমিক নবম+দশম	উচ্চমাধ্যমিক একাদশ+দ্বাদশ
* হিন্দু স্কুল	০+০	০+০
* হেয়ার স্কুল	০+০	০+০
* বেথুন স্কুল	০+০	০+০
* সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল	১+১	৩+৩
* বাগবাজার মালটিপারপাস	০+০	৭+৬

স্নাতক স্তরে সংস্কৃত শিক্ষার দুরবস্থা

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বস্তরে ভাষার গুরুত্ব কমানো হয়েছে। আগে স্নাতকস্তরে কলাশাখায় ইংরাজি বাঙলা ছিল অবশ্যপাঠ্য। এ ছাড়া অন্য দুটি 'ঐচ্ছিক বিষয়'

পড়তে হত। এখন তিনটি 'ঐচ্ছিক বিষয়' (৩০০×৩) পড়তে হয়। 'অনার্স' নিয়ে স্নাতক হতে হলে একটি ঐচ্ছিক বিষয়ে আটটি পেপার (৮০০) ও আরো দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ে তিনটি (৩০০×২) নিতে হয়। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যের সমস্ত স্তরের ছাত্রদেরই 'আবশ্যিক অতিরিক্ত' বিষয় (compulsory additional) নামে ইংরাজি বা মাতৃভাষার একটি পত্র নিতে হয়। এতে পাস করাই অগৌরবের। ইংরাজি বা মাতৃভাষার যেখানে এই অবস্থা, সেখানে সংস্কৃতের মতো মৃত বা জীবন্মৃত ভাষার আর কী প্রয়োজন? অবশ্য, ইংরাজি, মাতৃভাষা আর সংস্কৃত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। অনার্সও নেওয়া যায়।

উচ্চ মাধ্যমিকের পর ইংরাজি আদৌ না পড়লে চলে, বাঙলা-মাধ্যম স্কুলে ইংরাজি শুরুও হয় দেরিতে; অথচ মজা এই, ইংরাজির প্রয়োজন না কমে বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক কালে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে ভরতির হিড়িক বেড়েছে ভয়াবহভাবে। তুলনামূলকভাবে বাঙলার চাহিদা অনেক কমেছে। আর সংস্কৃতের কথা তো বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবাঙলার অধিকাংশ কলেজেই পড়ানোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ের ছাত্রছাত্রী এখন ডুমুরের ফুল। ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলি প্রায় ৩০,০০০ হাজার জন ছাত্রছাত্রী বি. এ (পাস+অনার্স) পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে মাত্র ৫০ জনের সংস্কৃত ছিল অন্যতম 'পাস' বিষয়। অথচ, স্নাতক স্তরে সংস্কৃতের পাসের পাঠক্রম অত্যন্ত সরল আর লঘু। উচ্চ-মাধ্যমিকে সংস্কৃত না থাকলেও স্নাতক স্তরে পাসে সংস্কৃত পড়তে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮-তে পার্ট ওয়ানে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে মাত্র ২০ জন, আর পার্ট টু দিয়েছে ২৩ জন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, এমনকী দর্শনের পাসের উত্তরপত্র দিনের পর দিন পড়ে থাকে পরীক্ষকের অভাবে। অতি অল্পসময়ে একেক জন পরীক্ষককে ৭০০-৮০০ খাতাও দেখে দিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক পরীক্ষক বন্ধু রসিকতা করে বলছিলেন: 'আমাদের খাতা দেখতে হয় ভার্টিক্যালি।' পক্ষান্তরে, সংস্কৃতের পরীক্ষক গড়ে পঁচিশটি মাত্র খাতা দেখেন সেই একই সময় ধরে। এতে শিক্ষার ভারসাম্য নষ্ট হয় বলে মনে করি। 'পাসে'র বিষয় হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস বা দর্শনের মতো সংস্কৃতও জনপ্রিয় হওয়া উচিত।

স্কুলে সংস্কৃতের মূলোচ্ছেদ ঘটাবার আগে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পড়ত। তাদের শিক্ষকতাবৃত্তি বা অন্যবৃত্তিতে যেতেও কোনো অসুবিধা হত না। কিন্তু ১৯৭৯ সালে মাধ্যমিক স্তরে 'তৃতীয় ভাষা' সংস্কৃত প্রকৃতপক্ষে উঠে যায়। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত (বা আরবি, ফারসি, হিন্দি) পড়ানো হয়। নবম শ্রেণীর থেকেই অনেক 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক' বিষয়সমূহের মধ্যে সংস্কৃত একটিমাত্র।

বর্তমানে পশ্চিমবাঙলার কলেজে-কলেজে সংস্কৃত শিক্ষক আছেন। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ কলেজেই ছাত্রসংখ্যা নগণ্য। নীচে কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজে সংস্কৃতর ছাত্রসংখ্যা দেওয়া হল (১৯৮৮-৮৯):

* প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজ (কো-এড.)

অনার্স	পাস
১ম+২য়+৩য় বর্ষ	১ম+২য় বর্ষ
৪+৭+৩	৮+৭

* বারাসাত সরকারি কলেজ (প্রাতঃ, মহিলা)

উ. মা.	পাস
একাদশ+দ্বাদশ	১ম+২য় বর্ষ
২+২	৪+৫

* বারাসাত সরকারি কলেজ (দিবা, কো-এড.)

উ. মা.	পাস	অনার্স
		১ম+২য়+৩য় বর্ষ
৬+০	৫+৮	১

* লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ (মহিলা)

উ. মা.	পাস	অনার্স
৫+০	৬+৪	৩+১+২

* বেথুন কলেজ (মহিলা)

উ. মা.	পাস	অনার্স
৫+১০	১৫+১০	১+০+০

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, চন্দননগর কলেজ ও মৌলানা আজাদ-এ ছাত্র প্রায় একেবারেই নেই।

বে-সরকারি কলেজ

* সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (দিবা)

উ. মা.	পাস	অনার্স
০+১	০+১	ছাত্রাভাবে উঠে গেছে

* স্কটিশ চার্চ কলেজ (কো-এড.)

উ. মা.	পাস	অনার্স
১০+৪	৫+২	১+১+০

* সরোজিনী নাইডু কলেজ (মহিলা)

উ. মা.	পাস	অনার্স
১৫+৪	৮+৯	৩+৪+৩

* ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ (কো-এড.)

উ. মা.	পাস	অনার্স
৮+৮	২+০	পড়ানো হয় না

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা

রাজ্যর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। সেগুলি হল: কলিকাতা, বর্ধমান, বিশ্বভারতী (কেন্দ্রীয়), যাদবপুর (দিবা ও নৈশ), রবীন্দ্রভারতী (দিবা ও নৈশ)। কৃতবিদ্য অধ্যাপক ও রীডাররা সেখানে সংস্কৃত পড়ান এবং গবেষণা করান। কিন্তু পড়ুয়া? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা নিম্নরূপ:

১ম বর্ষ, '৮৮	২য় বর্ষ, '৮৮	'৮৯-র পরীক্ষার্থী
২১	১৮	৪০

অন্য কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা এর চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই বেশি ছাত্র আকর্ষণ করে। এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে স্নাতক স্তরে অনার্স না থাকলে এম.এ.-তে ভরতি হওয়া যায় না। যেখানে দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসে অনার্স পেয়েও সকলে এম.এ. পড়ার সুযোগই পায় না, সেক্ষেত্রে সংস্কৃতে প্রি-এম.এ. পড়িয়ে এম.এ.-তে ভরতি করানো হয়। কারণ, কোনোরকমে ডিপার্টমেনট টিকিয়ে রাখতে হবে।

বিদ্যালয় স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বর্তমানে সংস্কৃতশিক্ষা কী অবস্থায় পৌঁছেছে এতক্ষণে তা বোঝা গেল।

ভবতোষ দত্ত কমিশন ও সংস্কৃত

১৯৮৪-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চশিক্ষার হাল হকিকত জানবার জন্য অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। দত্ত কমিশনের রিপোর্ট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও এ-তাবৎ অগৃহীত। অধ্যাপক দত্ত বর্তমানে কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার দুরবস্থা লক্ষ করেছেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি এ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে সংস্কৃত-পড়ুয়ার স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং অনেক কলেজেই যে সংস্কৃত-অধ্যাপকরা কর্মহীন দিন যাপনের গ্লানি ভোগ করছেন, তাও লক্ষ করেছেন। অধ্যাপক দত্ত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা আমাদের স্মরণ করিয়েছেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও যে এ ভাষা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, তাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। সংস্কৃতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি কিছু বাস্তব পরিকল্পনা দিয়েছেন। তিনি স্নাতকস্তরে 'ইনটার-ডিসিপ্লিনারি কোর্স' চালু করার কথা বলেছেন। একসময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলাদা অনার্স কোর্স চালু ছিল না। স্নাতক স্তরে অর্থনীতির অনার্স কোর্সেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু

অংশ পড়ানো হত। সংস্কৃতের সঙ্গে একাধিক বিষয়কে মিলিয়ে তিনি যেসব 'নূতন বিষয়' (অনার্স) চালু করার কথা বলেছেন প্রাসঙ্গিক বলে এখানে কেবল তাদেরই উল্লেখ করছি: ১. বাঙলা+সংস্কৃত, ২. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস+সংস্কৃত, ৩. ভারতীয় দর্শন+সংস্কৃত।

যেসব বিষয়ের পঠনপাঠনে সংস্কৃত খুবই প্রাসঙ্গিক, তিনি তাদের সঙ্গেই সংস্কৃতকে মেলাতে চেয়েছেন। বাঙলা অনার্সে তিনি অবিলম্বে একটি বা দুইটি পত্র সংস্কৃতের জন্য বরাদ্দ করতে বলেছেন। অবশ্য, বাঙলা অনার্সে 'রসবাদ', 'ধ্বনিতত্ত্ব' ও অলঙ্কারশাস্ত্র' পড়ানো হয়; কিন্তু সবই বাঙলা অনুবাদে। এখানে মূলগ্রন্থ পড়ানো কোনোমতেই অসম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পাঠে 'সংস্কৃত লেখমালা' (Inscription) ইংরাজী অনুবাদে না পড়িয়ে সংস্কৃতে পড়ানোই সঙ্গত। মূল সংস্কৃতে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন আকরগ্রন্থ দর্শনের পাঠক্রমে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। সংস্কৃত ভাষাকে যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা না হয়, সে বিষয়ে অধ্যাপক দত্ত আমাদের সতর্ক করেছেন। ভাষা ধর্মবিবিক্ত। তবে প্রাচীন ভারতীয় মনীষার সঙ্গে বর্তমানের যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখতে হলে এবং ভারতীয় সভ্যতাকে ভালোভাবে বুঝতে হলে সংস্কৃতচর্চা অপরিহার্য—এই তাঁর সিদ্ধান্ত। তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন :

…the encouragement for studying Sanskrit does not amount to Hindu Revivalism।

প্রবন্ধকারের দুইটি বিপরীত প্রস্তাব

প্রথম প্রস্তাব : বর্তমানে যেভাবে বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সংস্কৃতের পঠনপাঠন চলছে, তা অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে স্থির করতে হবে, সংস্কৃতের মতো একটি তৃতীয় ভাষার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা; যদি মনে হয় 'নেই', তবে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতেও এ ভাষাকে রাখবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে দু বৎসর আবশ্যিক হিসেবে পড়ার পর নবম শ্রেণীতে খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই সংস্কৃত নেয়। কোথাও-কোথাও দু-একজন নিতে চাইলেও রুটিন-অ্যাডজাসটমেনটের অসুবিধার জন্য তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়। আবার নবম-দশমে না পড়ে একাদশ-দ্বাদশে সংস্কৃত না পড়তে চাওয়াই স্বাভাবিক। স্নাতক স্তরেও একই কারণে পাসে আর অনার্সে ছাত্রাভাব। অথচ, একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজ্যের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (দুটিতে নৈশ বিভাগও আছে) সংস্কৃত বিভাগ রয়েছে। সেখান থেকে কিছু-না-কিছু ছেলেমেয়ে সংস্কৃতে এম. এ. ডিগ্রি নিচ্ছে। শিক্ষকতাবৃত্তিতে এলেই কোনো বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির প্রয়োজন। সংস্কৃতে শিক্ষকতাবৃত্তিতে আসার পথই যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানোর যৌক্তিকতা নেই। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা আর গবেষণাই যদি সংস্কৃতচর্চার মূল লক্ষ্য হয়, তবে একটি বা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃত-বিভাগ' থাকলেই যথেষ্ট। কারণ, শিক্ষকতাবৃত্তি বাদে অন্য কোনো বৃত্তিতে যেতে হলে কলাবিভাগের ছাত্রদের পক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরাজি বা ইতিহাস নেওয়াই সুবিধাজনক। আর সর্বক্ষেত্রে যেখানে সংস্কৃত-শিক্ষার অবনয়ন ঘটছে, সেখানে একজন সংস্কৃতের ছাত্র সহজেই মেলানকোলিয়ার শিকার হতে পারে। শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় কেবল আবেগ বা উচ্ছ্বাসের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে আমাদের যুগের চাহিদা এবং বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে হবে বৈকি! কাজেই বোঝার উপর শাকের আঁটি 'সংস্কৃত' না চাপানোই সঙ্গত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উদ্বাস্ত' অধ্যাপকদের অবশ্য অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যদি সংস্কৃতকে রাখার মতো করেই রাখতে

হয় তাহলে মাধ্যমিকের পাঠক্রমকে কিছুটা ঢেলে সাজাতে হবে। মাধ্যমিকের পাঠক্রম এখন যেমন আছে :

১. কর্মশিক্ষা (শারীরশিক্ষা ও সমাজসেবাসহ) =১০০
২. ভাষাবিভাগ (ইংরাজি ও মাতৃভাষা) =১০০+২০০
৩. বিজ্ঞানবিভাগ (গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান)=১০০+১০০+১০০
৪. ভারত ও তার অধিবাসী (ইতিহাস ও ভূগোল)=১০০+১০০
এ ছাড়া একটি 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়' =১০০

এই পাঠক্রমে নিম্নোক্তরূপ সংযোজন ও পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ক. বিজ্ঞান বিভাগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞান মিলিয়ে একটি পত্র রচনা (১০০) এবং ভূগোলকে বিজ্ঞান বিভাগে নিয়ে যাওয়া।

খ. ৪নং বিভাগের নতুন নামকরণ : 'ভারত ও তার সংস্কৃতি'; বিষয়—ইতিহাস, আর প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১০০+১০০)।

গ. ভাষাবিভাগের পুনর্বিন্যাস : ইংরাজি, মাতৃ-ভাষা ও অপর একটি 'ঐচ্ছিক তৃতীয় ভাষা': সংস্কৃত/হিন্দি/উর্দু/তামিল/বাঙলা (এই চারটিই জাতীয় ভাষা)—১০০+১৫০+১০০। এখানে একটি 'তৃতীয় ভাষা' যুক্ত হল যা বহুভাষাভাষী একটি দেশের পক্ষে খুবই স্বভাবিক। অ-বাঙলাভাষীরা 'তৃতীয় ভাষা' হিসেবে 'বাঙলা'ও নিতে পারে। বাঙলা-ভাষীরা বাংলা বাদে যে-কোনোটি নিতে পারে। মাতৃভাষায় 'পঞ্চাশ' কমানো হল।

ঘ. কর্মশিক্ষা বিভাগে কেবল শারীরশিক্ষার জন্য 'পঞ্চাশ' বরাদ্দ করে এ বিভাগের নতুন নামকরণ হোক 'শারীর শিক্ষা'।

ঙ. একগাদা 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়' রাখবার প্রয়োজন নেই। যে-বিষয় আবশ্যিকে আছে অতিরিক্তেও সে বিষয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত বিষয়-গুলো এরকম হতে পারে :

১. শারীরবিদ্যা বা এমন কোনো নতুন বিষয় যা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সহায়ক।
২. হিসাবশাস্ত্র
৩. সংগীত
৪. আরবি/ফারসি/ফরাসি

(এ তিনটি ভাষার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু না কিছু যোগ আছে। আরবি বা ফারসিকে 'ক্লাসিকাল' ভাষা হিসেবে না পড়িয়ে তাদের 'আধুনিক'রূপে পড়ানোই বাঞ্ছনীয়। কারণ, দুটোই আধুনিক জীবিত ভাষা, সংস্কৃত বা লাতিনের মতো প্রাত্যহিক প্রয়োজনে অব্যবহৃত ভাষা নয়।)

এ প্রসঙ্গে আর-একটি তথ্য দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। পশ্চিম বাঙলায় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ-এর মতো একটি মাধ্যমিক মাদ্রাসা বোর্ড আছে। এর অধীনে আছে ২০০টি স্কুল। এ-সমস্ত স্কুলে 'তৃতীয় ভাষা' আরবি অবশ্যপাঠ্য। ভূগোল ও কর্মশিক্ষা থেকে ৫০+৫০ কেটে নিয়ে আরবিতে '১০০র একটি গোটা পেপার রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও অবশ্য 'advanced Arabic' নামে একটি 'অতিরিক্ত অবশ্য-পাঠ্য আরবি'র পেপার আছে। এর উপর প্রচলিত মাধ্যমিকের মতোই আছে একটি 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়'। পরীক্ষা দিতে হচ্ছে 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক' বাদেই ১০০০-এর মধ্যে। কেবল ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য একই দেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার এ ধরনের হেরফের কাম্য নয়। যদি কিছু স্কুলে 'আরবি' অবশ্যপাঠ্য হতে পারে, তাহলে দেশের সব স্কুলেই আগের মতো 'সংস্কৃত/আরবি/ফারসি অবশ্যপাঠ্য করতে কোনো দুরপনেয় বাধা আছে মানি না।

* প্রবন্ধকার তথ্যের জন্য উল্লেখিত স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের কাছে ঋণী।

এই মানুষগুলো

আবুল হাসানাত

সপ্তাহখানেকের ছুটিতে এসেছে সে। কয়েকদিন চলেই গেল। আর দুটি দিন বাকি। তারপর আবার তাকে রাজশাহী যেতে হবে। ভার্সিটি খুলবে, এখন অবশ্য খোলা, কিন্তু বন্ধ হতে কতক্ষণ। ছাত্রদলগুলো, রাজনীতিক দলেরা, শিক্ষকেরা—সবাই পারস্পরিক স্বার্থ, কলহ, রণনীতি, রণকৌশল নিয়ে ব্যস্ত; কখন যে একটা তুলকালাম ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। কিন্তু তা পরবর্তী ঘটনা। এখন যে সব ঘটছে?

পড়বে-না-পড়বে-না করে এমন বাঘা শীত পড়েছে যে, দেহ তো কুঁচকে উঠছে, মনটাও একেবারে ঠাণ্ডা বরফের পিণ্ডের মতো হয়ে পড়েছে। লেপ মুড়ি দিয়ে ইশতিয়াক শুয়ে। দুপুরে খাওয়ার পর এই শীতে এর চেয়ে আনন্দঘন কর্ম আর কী হতে পারে! কিন্তু ঘুম আসে না; তার অভ্যেস নেই বলেই, কিংবা ঘটনা-তরঙ্গে সেও কিঞ্চিৎ দোলায়মান—তাই?

ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। আজ সকালেই ব্যাপারটি ঘটল।

মেজো ভাই কেবল নাস্তা শেষ করেছে। মেজো ভাবী স্যুটকেস হাতে নিয়ে বাবার বাড়ির পানে ধাবমান।

আবার কী হল?

গত মাসে এভাবে চলে গিয়েছিল, সে শুনেছে, আজ আবার।

নাসির তার মেজো ভাই। তার মতো এম. এ. পাশ করে অধ্যাপক হয় নি। বি. এ. অনার্স পড়তে-পড়তে চাকরি নিয়ে গেল জাপান। জাপান থেকে ফিরে এসে সবাইকে জানিয়ে, কিন্তু অমতে, এক উকিলের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। মেয়েটি আই. এ. পড়ছিল। পরের বছর তাকে নিয়ে জাপান পাড়ি। এক বছর যেতে না যেতেই শরীর ভেঙে, অসুখ বাধিয়ে দুজনেরই প্রত্যাবর্তন।

বড়ো ভাই রশীদ ব্যবসাসূত্রে থাকে চট্টগ্রাম, ভাবীকে নিয়ে বছরে আসে একবার। ঢাকায় কাজ থাকলেও আসে।

কিন্তু—

আসলে যেই পায় না ইশতিয়াক। প্রকৃতপক্ষে পিতার মৃত্যুর পর সে বুঝতে পারল বটগাছ নেই—বটগাছের নীচে যে বা যারা বসে-দাঁড়িয়েছিল তারা সরে পড়ল।

চোখের সামনে দেখল বড়ো ভাই ঢাকার ব্যাবসা অধিকতর লাভের অছিলায় চট্টগ্রামে নিয়ে গেল।

মেজো ভাই জাপানে।

আর ছোটো ভাই মার সঙ্গে স্ত্রীর জন্য, তার ভাবীর জন্য, ঝগড়া করে আলাদা হল।

এখন এই তিনতলা বাড়িটি হয়েছে পায়রার খোপ। নীচতলায় দুজন ভাড়াটে। দোতলায় একটি ঘরে মা থাকেন, আর একটি ঘর পড়ে থাকে বড়ো ভাইয়ের জন্যে, অন্য ঘরটি তার—ড্রইং রুমও বটে। আত্মীয়-স্বজন এলেও থাকে।

তিনতলার এক ঘরে এখন মেজো ভাই, অন্য ঘরে ছোটো ভাই, আর-একটি ঘরে এক বোনপো—।

ইশতিয়াক দেখে মা তার ঘরে টুকি মেরে চলে গেলেন। কলতলায়। তারপর বোধ করি যাবেন নীচতলায়। সব তদারকি করা তাঁর স্বভাব—অবশ্য এ কাজটি করতেন আব্বা। কোথায় আব্বা। কতদূরে। মৃত্যুর পর কী।

ইশতিয়াকের চোখদুটি ঝাপসা হয়ে আসে। সে পষ্ট করে কিছু দেখতে পায় না।

কিন্তু বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এই এক বছর আগেও তিনি বেঁচে ছিলেন। এই ঘরে বসে কতদিন তাকে বলেছেন, দুধটা খেয়ে নে। শরীর যা হচ্ছে তোর।

শরীর!

তার রোগা, অসুস্থ শরীর আজ কী হয়েছে! নিজের গরজে সে এখন খায়। খাওয়ার রুচি হয়েছে। খেতে ভালো লাগে তার। সে এখন সব খায়, বাদ-বিচার করে না। সে স্বাস্থ্যবান হয়েছে। অথচ দুধের গ্লাস ফেরত দিত—যে গ্লাসটি বাবা নিজ হাতে এনে তাকে দিতেন।

ইশতিয়াক চোখ মুছে নেয় হাত ঘসে। কেন যে এসব কথা মনে পড়ে!

সে ভাবে, তার মনে পড়া উচিত মাকে। কারণ তিনি বেঁচে, এবং বৃদ্ধা। হৃদ্‌রোগী। কখন হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়, কে বলতে পারে!

সেই মায়ের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। তিনি একা। একজন কাজের মেয়ে আছে তাঁর সঙ্গে।

এক-একবার তার মনে হয়, বড়ো ভাই যে সরে গেলেন, সেটা কি চরম স্বার্থপরতা নয়। স্বার্থান্ধ না হলে কেউ কি এমন অন্ধ হতে পারে। কেবল কি নিজেকে গুছিয়ে নেয়া, না আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে? সে জানে না সেসব কথা। ভাবী কত বাধা দিয়েছিল; বুঝিয়েছিল বড়ো ভাইয়ের কর্তব্য বাবার অবর্তমানে তার দায়িত্ব। পাথর গলে না!

মা বোধ করি ঠেকাতে পারতেন। কিন্তু না, তিনিই বলেছিলেন—ওর যদি উন্নতি হয়, আমি বাদ সাধব কেন। কিন্তু এসব কথার আড়ালে বড়ো সন্তানটির উপর মার যে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টি আর গভীরতর স্নেহ আছে, তা বুঝতে ইশতিয়াকের কষ্ট হয় নি।

এই ব্যাপারটি দেখে মেজো ভাইয়ের বিকার হলে, ইশতিয়াক কোনো দোষ দেখতে পায় না। জাগতিক উন্নতি আর বৈষয়িক সাফল্যই যদি মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য আর জীবনের লক্ষ্য হয়, সেও কোনো অন্যায় করে নি।

ছোটো ভাবী স্পষ্ট করেই বলেছিল, বিয়ের পরও মা আমাকে পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি এখন চাকরি করছি, আমারও ভবিষ্যৎ আছে, আমাকে এখন থেকেই ভাবতে হবে।

অবশ্য, ইশতিয়াক জানে, সব দোষ নন্দ ঘোষের বলা ঠিক হবে না। মারও অনেককিছুই সে সমর্থন করতে পারে নি। সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া

করা ঠিক নয়।

মা অবশ্য তা মানতে চান নি।

সরোষে তিনি ইশতিয়াককে বলেছিলেন, আসল কারণ তা নয়। ওই যে আমি বলেছি তোমার পড়ার সময় আমি আদর-যত্ন করেছি, এখন তুমি করো। এই কথা বলা-ই কাল হয়েছে। কেন, অফিস করলে যত্ন-আত্তি হয় না? করা যায় না?

ইশতিয়াক পাশ ফিরে শোয়। মনে-মনে ভাবে এর নামই সংসার।

জাপানফেরতা ভাই মাকে দেখবে বলেও মাস-খানেকের মধ্যে আলাদা হেঁশেল করল।

অবশ্য দুই বউয়ের মধ্যে যে ঈর্ষা, বা ঝগড়ার চিক্, তার উৎসমূলে মা।

মার কি এ কথা বলা উচিত: যার কাজ তার সাধে, অন্য লোকের লাঠি বাজে!

ঘটনাটি এমন কিছুই নয়।

মেজো ভাইয়ের ঘরে বিদেশী জিনিসপত্র ঠাসা। ভালো ফুলদানি, ভালো ফ্রিজ, দামি আলমারি, ড্রেসিং টেবিল।

পাশাপাশি ঘর। ছোটো বউ এসব দেখে এবং স্বামীর কাছে দাবি করে কিছু জিনিসের। ছোটো ভাই শেষ পর্যন্ত একটি টু-ইন-ওয়ান কিনে দেয়।

মা কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, হ্যাঁরে নাহিদ, টাকা-পয়সা নষ্ট করছিস কেন? সব কাজ কি সবার সাজে, না হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয়। মেজো বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোর বউ পারবে?

কথাটা শিরিনের কানে যেতে দেরি হল না। শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করল না সে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল, হিসেব করে সংসার চালিয়ে, বাড়তি খরচ কমিয়ে, পাই-পাই জমিয়ে সে সবকিছু করবে।

মা আর-একবার টুকি দিলেন। সে ঘুমিয়ে মনে করে তিনি বেরিয়ে যান।

মা কিজন্যে ঘুরঘুর করছেন, ইশতিয়াক জানে। তাকে বিয়ে করতে হবে এবং সে বউটি নিয়ে তিনি সুখের সংসার পাতবেন।

এর আগেও কয়েকবার কথা হয়েছিল। সে মৃদু-হাস্যে তাঁকে বলে ছিল, কী করে ভাবলেন, আপনার সে বউটি মনের মতো হবে।

তিনি হেসে বলেছিলেন, ভাগ্য কি বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করে?

তার যে বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না তা নয়, সে করবে। বউ এসে মার সঙ্গে থাকবে, তার কোনো আপত্তি নেই। বউ যদি তাঁর সঙ্গে না থাকতে চেয়ে রাজশাহীতে ইশতিয়াকের সঙ্গে বসবাস করতে চায়, সে বাধা দেবে না।

মায়ের কথায় সে অবশ্য ভয় পায়। নাটক-নভেলে পড়া কিছু রোমানটিক চিত্র আর এই বাস্তবতা তাকে প্রায় অসহিষ্ণু, সন্দিগ্ধ ও সংশয়ী করে তোলে। সবচেয়ে ভাবায় বিদেশী টাকা—এ যে সামাজিকবিন্যাস পর্যন্ত ভাঙতে বসেছে। মধ্যবিত্তের প্রতিযোগিতার, ঈর্ষার, জ্বালার সীমা বাড়িয়ে তুলেছে।

বিশেষ করে ছোটো ভাইয়ের পরিবর্তন তাকে চমকে দেয়। সে অধ্যাপক মানুষ, পড়াশোনা নিয়েই থাকে। ভাবীও সহজ-সরল ছিল। দেখা গেল তারাও বদলে যাচ্ছে।

বড়ো হবে। যা-কিছু দরকার সংসারে—গাড়ি-বাড়ি-শাড়ি—সব ধীরে-ধীরে করে নেবে। মা একদিন পাঁচ আঙুলের কথা বলে থোঁটা দিয়েছিলেন, তা মিথ্যে প্রমাণ করবে। বলবে, ওটা ছেঁদো উপমা।

দেখেছ মায়ের কাণ্ড। আমরা উঠি—মা চান না। তোমাকে তেমন ভালোবাসেন না মনে হচ্ছে।

স্ত্রী শিরিনের কথায় নাহিদ কাঠহাসি হেসেছিল। হেসেছিল এজন্যে যে শিরিনের অভিযোগ অসত্য নয়। মাকে সে চেনে। মা সহজেই মানুষকে কাছে টানতে পারেন, আবার দূরেও ঠেলতে পারেন। প্রিয়জনকে এমন কথা ফস করে বলে ফেলবেন যে সে দূরে সরে যাবে। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি বড়ো নরম, কোমল এবং অনুভূতিশীল। তিনি গুছিয়ে রেখেঢেকে কথা বলতে অপারগ। কিন্তু তাঁর বহিঃস্তরের পুরো চামড়া ভেদ করে কেউ তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করলে সহজেই উপলব্ধি করবে মানুষটির মুখ আর মন এক নয়। এসব কথা নাহিদ যে জানে না, তা নয়। কিন্তু কে আছে এমন মানুষ এ যুগে যে গুরুজন হলেই মাথায় তুলে রাখবে, বিনয়ে অবনত হবে, গুরুজন বা বৃদ্ধা বলে সহ্যানুভূতিশীল হবে।

তবুও নাহিদ বলেছিল, তা নয় শিরিন। কোন্ মা চায় না তার সন্তান বড়ো হোক। ওটা রাগের কথা। তা ছাড়া ও কথার আড়ালে কথা আছে। উনি বলতে চাচ্ছেন, সোফা-সেট-ফ্রিজ কিনে টাকা নষ্ট না করে ওই টাকা জমিয়ে ধীরে-ধীরে একটু জায়গা কেনো, যাতে পরে বাড়ি করা যায়।

শিরিন ফোঁস করে উঠেছিল: রাখো তোমার দ্ব্যর্থবোধক কথা। আমি কচি খুকি, কিছু যেন বুঝি না।

নাহিদ আর তিল থেকে তাল করার সুযোগ নেয় নি। সে জানে কথার পিঠে কথা বাড়ে, দরকার কী।

এসব কথা নাহিদই জানিয়েছিল ইশতিয়াককে। বলেছিল, তুই যখন বিয়ে করবি, ঠাণ্ডা বউ আনবি, রাখবি নিজের কাছে। দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষের অবকাশই দিবি না।

ইশতিয়াক ছোটো ভাইয়ের কথায় মনে-মনে হেসেছিল। কিন্তু উত্তর দিয়েছিল এই বলে, তুমি ভেবো না, ভাইয়া। 'প্রবলেম' আমি আগেই 'সলব' করে রেখেছি।

সে আবার কী?

আমি বিয়েই করব না।

দূর পাগল!

কেন?

বিয়ে খুব ভালো কাজ। কর, তখন বুঝবি।

তবে যে লোকে বলে, দিল্লীকা লাড্ডু খায়েগা পস্তাবে, নাহি—

ওসব বাজে কথা। সবকিছু নির্ভর করে 'অ্যাডজাস্ট' এর উপর।

লেপটা ঠেলে দিয়ে ইশতিয়াক উঠে বসে।

অ্যাডজাস্ট? তা তোমরা পাচ্ছ না কেন?

সে তো জানে মাকে 'ট্যাকল' করা খুবই সহজ। মা চান নরম গলা, হেসে মিষ্টি করে কথা বলা, একটু আদর, একটু শ্রদ্ধা, মাঝে-মধ্যে দু-একটা উপহার; খোঁজ-খবর নেয়া, কোনো কাজকর্ম থাকলে তা করে দেয়া।

সংসারে এটা কি খুব কঠিন? বিশেষ করে ছেলের পক্ষে মায়ের জন্য? মায়ের জন্য পুত্রবধূর নিকট থেকে? কন্যার কাছ থেকে? জামাইয়ের কাছ থেকে?

ইশতিয়াক হঠাৎ খেপে যায় রশীদের উপর। যত নষ্টের মূলে ওই। বড়ো সন্তান হিসেবে বাবার মৃত্যুর পর তার দায়িত্ব কি বেশি ছিল না? কোন্ দায়িত্বটা সে পালন করেছে? না মাকে দেখে, খোঁজ-খবর নেয়, না স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেয় মাঝে-মধ্যে এখানে থাকার জন্যে। বরং বড়ো ভাইয়ের মজা। ঢাকায় এসে ব্যবসায়ের কাজকর্ম সেরে মায়ের বাড়িতে থেকে খেয়ে-দেয়ে বিদায়। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনা, একবার বড়ো ভাই এসে দেখে কাজের মেয়েটি নেই; মা নিজেই রান্নাবান্না করে খাচ্ছেন। এমনকী ঝাঁটও দিতে হচ্ছে। একটা নতুন কাজের মেয়ে ঠিক করে দেওয়ার সময় পর্যন্ত তার হয় নি, চটপট চট্টগ্রামে ফেরত গেছে। আর মায়ের কপালও এমন খারাপ, ওই সময় ছোটো ভাবীর সঙ্গে কথা বন্ধ ছিল, সেও তার লোক দিয়ে সাহায্য করে নি। মেজো ভাবী তখন জাপানে।

দেওয়ালে চোখটি আটকে যায় ইশতিয়াকের। বাবার ছবি। ছোটো ভাই বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে। লাভ আছে কোনো? কী করবেন উনি? কেবলই ছবি। তার স্থির বিশ্বাস, বাবার মৃত্যু অনুচিত। তাঁর মারা যাওয়া ঠিক হয় নি। দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি। কী সুন্দর তাকিয়ে আছেন—মনে হচ্ছে তার দিকে। এখনই কথা বলে উঠবেন। অন্যদিকে

ঘড়িটি। ঠিকই চলছে। শুধু তার বাবার হৃৎ ঘড়িটি বন্ধ হয়ে গেল। চোখ আবার ঝাপসা হয়ে আসে।

এ-সময়ে মা ঢোকেন।

কী রে ঘুম ভাঙল? চা করব?

এই সময় শিরিন ঘরে ঢোকে।

ট্রেতে দু-কাপ চা আর বিস্কুট।

নাও। মার দিকে তাকিয়ে বলে, মা খান।

ছোটো ভাবীর এটা তার বেশ ভালো লাগে, সংসার আলাদা হয়ে এই শান্তিটা এসেছে। এই দেয়া-নেয়া। সবাই মিলে এক হব না, তবে একত্র হব। বেশ তাই হোক।

হাতমুখ ধুয়ে সে চায়ের কাপটা তুলে নেয়। মা খাচ্ছেন।

তার বউ এলে এমনিভাবে চা খাওয়াবে?

কিন্তু—

ইশতিয়াক চিন্তিত হয়ে ওঠে। লেকচারার হিসেবে যে মাইনে পায় সে তাতে কি বিয়ে করা চলে? বিয়ে করে কি সংসার চালানো যাবে?

সেই মেয়েটি কি মেনে নেবে। এই সংসারের এই ব্যবসায়ী ভাই, বিদেশফেরত ভাই—তাদের উপচে-পড়া জিনিসপত্র, বিলাসব্যসন, টাকাপয়সা—এসব দেখে সেও কি বদলাবে না? ধ্যানধারণা পালটাবে না? পৃথক সংসার যদি তারা পাতে, তবুও ঈদ-বকরিদে সবাই এখানে মিলিত হবে, তখন কি ঐ অর্থজাত পার্থক্য নজরে পড়বে না আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, ভঙ্গিতে, ব্যবহারে? হয়তো বিদেশ-ভ্রমণের কথা উঠবে, হয়তো গুলশানে বাড়ির কথা উঠবে, হয়তো গাড়ি কেনার কথা উঠবে, হয়তো চার-পাঁচ লাখ টাকা সেলামি দিয়ে ঘর নেওয়ার কথা—ব্যাবসার জন্যে—তখন, সেসব শুনে সে কি সহ্য করতে পারবে, মেনে নেবে, অ্যাডজাস্ট করতে পারবে, না কঠিনভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে?

বড়োই অসহায় মনে হয় নিজেকে।

শিরিন বলে, কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে? মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, বিস্কুট নিলে না, মা?

নাসের এসে ঢুকল।

মা বলে উঠল ওকে দেখে, রীনা চলে গেল?

নাসির মাথা নাড়ে।

বেশ বোঝা যায় সে এসব আলাপ করতে চায় না। তার ভাবটা—যার যাবার যাক না, ফেরার হলে ফিরবে। সংসারে অর্থই সুখের আকর নয়।

ইশতিয়াক বলে, দোকান নিয়েছেন?

নিলাম। কাপড়ের ব্যাবসা করব ঠিক করেছি।

গুড। ইশতিয়াক খুশি যেন।

এই নিয়েই তো ঝগড়া। তারপর একটু থেমে ইতস্তত করেই বলে, তোমার ভাবীর ইচ্ছে একটা বাড়ি কিনি—তারপর ভাড়া দিই। ভাড়া দিয়ে হাজার চার-পাঁচ তো আসবে। ফ্ল্যাট-বাড়ি কত পাওয়া যাচ্ছে। এবং আমি একটা চাকরি নিই।

হায় বাঙালি, সেই চাকরি। ইশতিয়াক কথাটা বলে মায়ের দিকে তাকায়, বলে, আপনার টাকাগুলো ধার দেন, ব্যাবসা করি। চাকরি করে ভাত হয় না।

মা স্পষ্ট করে বলে দেন, তোকে টাকা দেব কেন? নিজে যা পারিস কর।

পরে তো দেবেন।

সে আমি মরলে, নিস ··

এই সময় কার যেন ডাক শোনা গেল।

আরে বড়ো ভাইরা—

রশীদ, মিনা তাদের ছেলে টিপু এসে দাঁড়াল।

শব্দ পেয়ে তিনতলা থেকে নাসিরও নেমে আসে।

মুহূর্তে ঘরটি গরম হয়ে ওঠে। হাসি-ঠাট্টা-তামাশা চলে। খাওয়া-দাওয়া হয়।

একটি বৃহৎ পরিবার যেন পিকনিকে মাতে।

ইশতিয়াক টিপুকে লক্ষ করে। বেশ সুন্দর হচ্ছে ছেলেটা। বড়ো ভাবীও। স্বাস্থ্যবতী এখন। বেশ দামি শাড়ি পরনে।

কিন্তু এসব বাহ্যিক। সে ভাবে, এইসব মানুষ কেবল কি সংসারে বড়ো হওয়ার জন্যে ছুটছে,

আরাম-আয়াশের জন্যে, সুখের জন্যে? না কোনো উদ্দেশ্য আছে? জীবনের, জীবন-যাপনের?

সে ওদের দিকে পরিষ্কার কোনো ছবি দেখতে পায় না; স্পষ্ট কোনো উত্তরও দেখে না; কোনো পাঠও পড়তে পারে না। তবে মনে হয়—এই মানুষ-গুলো স্পষ্টই পুতুল, যেমন নাচায় তেমনি নাচে, কিংবা যন্ত্র—যন্ত্রের মতো অন্ধ হয়ে জীবনের পথে ছুটছে—লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, মনজিল কোথায় তাও জানে না। ইশতিয়াক ভাবে, সেও কি এদের

বাংলাদেশ

মতো একটা যন্ত্র, না জীবনের অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে বলে বিশ্বাস করে? এই সময় তার চোখটি পড়ে মৃত পিতার ছবির দিকে। তিনি কি কোনো দিক-নির্দেশ দিয়ে যান নি—জীবনে, জীবনের আচরণে, কথায় আর কাজে?

সে বড়ো অসহায় বোধ করে। এবং এই মানুষ-গুলোর মধ্যে সেও একজন মানুষ ভেবে তার অসহায়ত্ব আরো বেড়ে যায়।

বাঙলায় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার বিবর্তন

অমিতাভ রায়

প্রয়োজনের নিরিখে

ভারতবর্ষের বর্তমান বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী, বিদ্যুৎ উৎপাদন-বন্টন প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্ব হয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের অথবা ভারত সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থা পালন করে। কিন্তু সত্তর দশকে রাজ্যের অভূতপূর্ব বিদ্যুৎ-সংকটের দাপটে সি. ই. এস. সি. বেসরকারি মালিকানাধীন হওয়া সত্ত্বেও নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র সংস্থাপনের দায়িত্ব পায়। ১৯৭৯-এর ২২শে এপ্রিল সি. ই. এস. সি.-র টিটাগড় জেনারেটিং স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

টিটাগড় জেনারেটিং স্টেশনে চারটি ৫০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট আছে। টিটাগড়ে ইউনিটগুলি যথাক্রমে ১৬ই মার্চ ১৯৮৩, ৬ই জুলাই ১৯৮৩, ১৬ই জুলাই ১৯৮৪ এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। টিটাগড় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদন শুরু করায় কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু টিটাগড় চালু হওয়ার সাথে-সাথে সি. ই. এস. সি.-র সাবেক উৎপাদনকেন্দ্রগুলির উৎপাদন ভীষণ কমে গেছে। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বর্ষে গার্ডেনরীচের সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশন তো বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। তবে সুখের কথা, ওই একই জায়গায় একটি নতুন ১২০ (৬০ × ২) মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বর্তমানে তৈরি করা হচ্ছে।

চুখা : সহযোগিতার নিদর্শন

ভূটানের ওয়াংচু বা বাংলার রায়ডাক নদীর প্রবাহকে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে ৩৩৬ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার চুখা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা (ইলেকট্রিক্যাল অ্যাডভাইসর) জে. ডব্লিউ. মিয়ার্স ভারতের জলসম্পদ সংক্রান্ত প্রথম সমীক্ষার অন্তরবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। এই সমীক্ষার চূড়ান্ত

রিপোর্ট পেশ করা হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত কার্যরত ভারতের শিল্প-সংক্রান্ত কমিশন এই ধরনের একটি সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তদনুযায়ী ভারত সরকার তৎকালীন সংযুক্ত প্রদেশের চীফ ইনজিনিয়ার জি. টি. বার্লোকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন; তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন সরকারের বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার সহযোগিতায় কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করেন। কিন্তু কাজটি শুরু করার কিছু দিনের মধ্যেই জি. টি. বার্লো মারা যান। সুতরাং উল্লিখিত রিপোর্টটি 'মিয়ার্স সার্ভে' নামেই পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষের জলসম্পদ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসেব-নিকেশ-পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে মিয়ার্স সার্ভের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে।

মিয়ার্স সার্ভেতে ভূটানের জলসম্পদ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পরিবেশিত হলেও ১৯৬১-র আগে এ বিষয়ে কারও নজর পড়ে নি। ভূটানরাজের অনুরোধে ভারতের কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সেনট্রাল ওয়াটার কমিশন) ভূটানের জলসম্পদ সংক্রান্ত পুরোনো সমীক্ষাকে পুনর্বিবেচনার কাজে মনোনিবেশ করে। ভারতের সেনট্রাল ওয়াটার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭১-এ ভূটানের চুখায় একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর পরিকল্পনা রচিত হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৫ এই বারো বছরে চুখা প্রকল্পর অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চারটি ৮৪ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সমন্বিত এই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রথম দুটি ইউনিটে ১৯৮৬ থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। আর চারটি ইউনিট সংস্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হবার পর সামগ্রিকভাবে চুখা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রর বাণিজ্যিক উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল গত ২১শে অকটোবর, ১৯৮৮। চুখা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ভূটানে অবস্থিত, কিন্তু কেন্দ্রটি সংস্থাপনের যাবতীয় কৃতিত্ব ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ-শ্রমিকের প্রাপ্য। চুখা কেন্দ্রর যাবতীয় যন্ত্রপাতি ভারতে নির্মিত। মাত্র ২৪৪ কোটি টাকা খরচ করে ৩৩৬ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র পাহাড়ের গহ্বরে বিশ্বের বৃহত্তম সুড়ঙ্গ কেটে যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের পরিচায়ক। চুখা জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত ভারত-ভূটান চুক্তি অনুযায়ী, এই কেন্দ্রটি সংস্থাপন সংক্রান্ত সমুদয় খরচের ৬০ শতাংশ ভারতের অনুদান। বাকি অর্থ ৫ শতাংশ সুদে ভূটান সরকার ঋণ হিসেবে নিয়েছে,—যা উৎপাদন শুরু হবার ১২ বছর পর থেকে ভূটান শোধ করতে শুরু করবে। চুক্তি অনুযায়ী চুখা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ভূটানের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ পুরোটাই ভারত পাবে। ১৯৮৬-তে দুটি ইউনিট চালু হবার পর থেকেই ভারত চুক্তি অনুযায়ী উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ পাচ্ছে। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ ভারতের 'জাতীয় জলবিদ্যুৎসংস্থা' (ন্যাশন্যাল হাইডেল পাওয়ার কর্পোরেশন, সংক্ষেপে, এন. এইচ. পি. সি.) পশ্চিমবাঙলা, বিহার, ওড়িশা, সিকিম ও ডি. ভি. সি.-র কাছে বিক্রি করে। এন. এইচ. পি. সি. চুখা কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে ১৫ পয়সা প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কিনে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদের কাছে ২৭ পয়সা প্রতি ইউনিট দরে বিক্রি করে। পশ্চিম বাঙলা ছাড়া অন্য কোনও ক্রেতা চুখার বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচালন ও বন্টন ব্যবস্থা (ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম) যথাসময়ে বাস্তবায়িত না করায় বর্তমানে চুখায় উৎপাদিত বিদ্যুতের একটা বড়ো অংশই পশ্চিমবাঙলা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতেও এই ব্যবস্থা অটুট থাকবে। কারণ প্রথমত দারিদ্র্যের জন্য ভূটানের বিদ্যুৎ চাহিদা কম। দ্বিতীয়ত বিহার, ওড়িশা, সিকিম ও ডি. ভি. সি. চুখার বাড়তি বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এখনও পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেয় নি। সুতরাং পশ্চিমবাঙলায় অবস্থিত না হয়েও চুখা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবে পশ্চিমবাঙলার বিদ্যুৎব্যবস্থার একটি উপাদান হিসেবেই কাজ করছে।

এ বং ফা রা ক্কা

মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ব্যারেজ সন্নিহিত এলাকায় একটি বৃহদায়তন তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র (সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন) নির্মাণের বিষয়ে সেই ষাটের দশক থেকেই কথাবার্তা হচ্ছিল। কারণ এখানে জলের প্রাচুর্য আছে ; এবং মাত্র ৮০-৯০ কিলোমিটার দূরের রাজমহল খনি এলাকা থেকে কয়লা সংগ্রহ সম্ভব। কিন্তু ১৯৭৫ থেকে ভারত সরকারের সংস্থা 'জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ কর্পোরেশন' (ন্যাশন্যাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন সংক্ষেপে এন টি পি সি) ফারাক্কায় প্রথমত প্রথম পর্যায়ে তিনটি ২১০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপনে ব্যস্ত। এর মধ্যে প্রথম ইউনিটটি ১লা জানুয়ারি ১৯৮৬এবং দ্বিতীয় ইউনিটটি ২৪শে ডিসেমবর, ১৯৮৬ থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। তৃতীয় ইউনিট এখন সংস্থাপনের দিন গুনছে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পর্যায়ে ফারাক্কায় আরও তিনটি ৪৮০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপনের প্রস্তাব আছে। সব মিলিয়ে ফরাক্কা প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে, এর নিহিত উৎপাদনক্ষমতা দাঁড়াবে সর্বমোট ২০৭০ মেগাওয়াট।

ক থা শে ষে র আ গে

একটি উন্নয়নশীল দেশে ক্রমাগত বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষেও এই তত্ত্বগত বিষয়টি ভীষণভাবে প্রযোজ্য। পশ্চিমবাঙলাও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৪৭-এর তুলনায় এই রাজ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন, ব্যবহার দুই-ই অনেক বেড়েছে ঠিকই কিন্তু চাহিদা বেড়েছে আরও বেশি। সুতরাং ঘাটতি বর্তমান ; আর চাহিদার সঙ্গে সমতা রেখে উৎপাদনক্ষমতা সম্প্রসারিত না হলে, উৎপাদনব্যবস্থা দক্ষতাসমৃদ্ধ না হলে বিদ্যুৎসংকট দূর হতে পারে না। এইসব ধারণা-ভাবনার নিরিখে পশ্চিমবাঙলায় আগামী দিনের প্রয়োজনে আরও কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র সংস্থাপনের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে। তার মধ্যে প্রস্তাবিত বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র সকলের নজর কেড়েছে। বীরভূম জেলার সদর শহর শিউড়ি থেকে শিউড়ি-দুবরাজপুর রোড বরাবর ১২ কিলোমিটার দূরে মুথুবেড়িয়া নামক স্থানে প্রস্তাবিত বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত। ৮৪০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার এই প্রস্তাবিত তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক স্তরে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও গত ২৮শে সেপটেমবর-এ '৮৮ প্রকল্পটির শিলান্যাস করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাঙলা পিছিয়ে নেই। সূর্য বা হাওয়ার শক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করে রাজ্যের দূর-দুরান্তের গ্রাম-গ্রামান্তরে বিজলি বাতির অথবা বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প ব্যবহারের ব্যবস্থা এই রাজ্যে শুরু হয়েছে। অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত যে জায়গাগুলি সাধারণ-ভাবে দুর্গম, এমন বেশ কিছু এলাকায় প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় এবং এহেন পরিবহণব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ প্রচণ্ড শক্ত হওয়ায় এইসব এলাকায় সৌর শক্তি এবং হাওয়ার দাপট থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করার প্রযুক্তি সংস্থাপিত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় ৪৫০টি সৌর ফোটো-ভোলটাইক কোষ (সোলার ফোটো ভোলটাইক বা এস. পি. ভি. সেল) চালিত বিজলি বাতি সংস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি ইউনিট একটি ২০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে সক্ষম এবং প্রতিটি এস. পি. ভি. ইউনিট স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গাসাগর মেলা-খ্যাত সাগর-দ্বীপের পূর্ব পাশে অবস্থিত মৌসুমী দ্বীপে প্রতিটি ৩০০ ওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার তিনটি উইণ্ড জেনারেটর বা হাওয়া মারফত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র ১৯৮৮র ৭ই মার্চ সংস্থাপিত হয়েছে। এগুলি সক্রিয়। বিদ্যুতের চাহিদা আরও বাড়বে। ১৯৮৬-৮৭-র হিসেব অনুযায়ী পশ্চিম বাঙলায় মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বছরে ১৩৭'২১ ইউনিট (কিলোওয়াট-আওয়ার)। এর মধ্যে গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে ২১'৭৩ ইউনিট, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ১৩'২৪ শিল্পক্ষেত্রে ৭৫'৮৬ ইউনিট, কৃষিক্ষেত্রে ২'৩১ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল। পক্ষান্তরে ঐ একই সময়ে দিল্লীর মাথাপিছু বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৫৫৯'৫ ইউনিট যার মধ্যে গার্হস্থ্যক্ষেত্রে ১২৯'০৯ ইউনিট, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ১১০'৪২ ইউনিট এবং শিল্পক্ষেত্রে ১৮৯'১৭ ইউনিট ব্যবহৃত হয়েছিল। তারতম্যটা লক্ষণীয়।

সুতরাং আগামী দিনে প্রতিদিন-রাতদিন অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখতে উত্তরোত্তর বর্ধিত চাহিদাকে সামাল দিতে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। অন্যথায় এ রাজ্যে বিদ্যুৎ আগমনের শততম বর্ষ পালনের সময় হয়তো একই সাথে সমগ্র রাজ্য বিদ্যুৎ-ঝলমল হয়ে না উঠতে পারে। অতএব তিমিরবিনাশী বিজলিকে এ রাজ্যে এখনও বহুপথ হতে হবে পার।

১

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদলীয় ব্যবস্থা ও কয়েকজন মার্কসবাদী

নিজেদের দেশে বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে নানা রকমের সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

হাঙ্গেরির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ভবানী সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর লেখা "চেনজ ইন হাঙ্গেরি : এ মাল্টি-পার্টি সেট-আপ ?" নিবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেন যে হাঙ্গেরির সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই পার্টি পৃথিবীতে প্রথম বহুদলীয় কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, মিখাইল গোরবাচভ একদলীয় ব্যবস্থার মধ্যেই বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন।[২] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মেরি ডেজেভস্কি তাঁর লেখা "উইনডস অব চেনজ - ১ : গরবাচভ লেটস দ্য পিপল স্পীক" নিবন্ধে এই মন্তব্য করেন যে, গোরবাচভ তাঁর অলিখিত ভাষণে এ কথা ঘোষণা করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুদলীয় ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করা অকিঞ্চিৎকর কাজ।[২]

কোন্-দলীয় ব্যবস্থা শ্রেয়?—এই প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর হাঙ্গেরির ভিন্নধর্মী অবস্থান লক্ষ করে, হাঙ্গেরিতে গৃহীত বহুদলীয় ব্যবস্থার কাঠামো মার্কসবাদসম্মত কি না, তা নিয়ে সংশয় অনেকের মনে দেখা দিতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে একদলীয়-বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রশ্নে মার্কস এবং মার্কসবাদীদের অবস্থানের সঠিক মূল্যায়ন করতে গেলে প্রয়োজন তাঁদের লেখা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নিবন্ধ আর ভাষণের সঠিক অনুধ্যান।

মার্কস-এঙ্গেলস

মার্কস এবং এঙ্গেলসের কথা আলোচনা করতে গিয়ে রিচার্ড এন. হানট তাঁর "দ্য পলিটিকাল আইডিয়াজ অব মার্কস অ্যানড এঙ্গেলস", খণ্ড ১, বইতে লিখেছেন যে মার্কস আর এঙ্গেলসের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণায় সমস্ত শ্রমিককে যে একটামাত্র দলকে সমর্থন করতে হবে—এমন কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নি। এই ধারণায় একটামাত্র মার্কসীয় দলের অবস্থান এবং অন্যান্য দলের দমনের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনও পাওয়া যায় না। হানট একথা উল্লেখ করেছেন যে মার্কস আর এঙ্গেলস শান্তিপূর্ণ বিরোধিতার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[৩] একইভাবে মনটি জনস্টোন তাঁর লেখা "সোস্যালিজম, ডেমোক্র্যাসি অ্যানড দি ওয়ান-পার্টি সিস্টেম" নামক নিবন্ধে এই মত পোষণ করেছেন যে মার্কস আর এঙ্গেলস কোথাও এ ইঙ্গিত করেন নি যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার আকার ধারণ করবে। প্রকৃতপক্ষে পারি কমিউন একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে নি।[৪]

হানট আর জনস্টোনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন মার্কস আর এঙ্গেলসের নিজস্ব বিভিন্ন লেখার ভিত্তিতে তাঁদের অবস্থানের সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

পারি কমিউনের (যার মধ্যে দিয়ে এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিফলন দেখতে পান) উল্লেখ করে মার্কস বলেন যে কমিউনের অধিকাংশ সভ্যই সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না।[৫] ব্লাঙ্কি-বিরোধী এঙ্গেলস এই মত ব্যক্ত করেন যে ব্লাঙ্কিবাদ বিপ্লবের পর যে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করে তা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন কায়েম করে।[৬]

মার্কস আর এঙ্গেলসের এই মতের উপর নির্ভর করে আমরা কখনই বলতে পারি না যে তাঁরা বিপ্লবোত্তর সমাজে একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন।

কাউটস্কি

একদলীয় বনাম দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমস্যা কার্ল কাউটস্কির লেখায় খুবই গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রথমেই একথা বলতে হবে যে বিপ্লবোত্তর সমাজে কাউটস্কি একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে কেবলমাত্র বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেই একদলীয় একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও যদি একটা দল শাসনক্ষমতা লাভ করে, তাহলে ওই দল শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশ হিসাবে অন্যান্য অংশের উপর একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতার ব্যবহার করবে।[৭]

তাহলে একদলীয় একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের সম্ভাবনা-রোধে কাউটস্কি কোন্ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিলেন ?

তিনি বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে একদলীয় একনায়কতন্ত্রকে রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। বহুদলীয় সরকারের উপর তাঁর নির্ভরতার প্রমাণ হিসেবে পারি কমিউন সংক্রান্ত তাঁর মূল্যায়নের উল্লেখ করতে পারি। তিনি মন্তব্য করেন যে একদিক থেকে বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে, পারি কমিউন ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র থেকে উৎকৃষ্ট। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দলই পারি কমিউন পরিচালনায় যোগ দেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটামাত্র সমাজতান্ত্রিক দল অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে বঞ্চিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।[৮]

সুতরাং, আমরা দেখি, বিপ্লবোত্তর যুগে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাউটস্কি বহুদলীয় ব্যবস্থাকে মেনে নেন।

কিন্তু এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, কাউটস্কির চিন্তাধারায় পরিষ্কারভাবেই অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। একদিকে আমরা দেখি, কাউটস্কি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বহুদলীয় সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের পক্ষে দাঁড়ান, আবার অন্য দিকে আমরা একই সাথে লক্ষ করি যে জার্মানিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সমাজতান্ত্রিক আর অসমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণে গঠিত বহুদলীয় সরকার স্থাপন সমর্থন করেন। সুতরাং, জার্মানির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে ভূমিকা নেন, তার উপর নির্ভর করে বলা যায়, তিনি এই সময় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে সরে আসেন।

লেনিন

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে একদলীয় / বহুদলীয় ব্যবস্থার বিতর্কে মার্কসবাদীদের অবস্থানের বিচার করতে গেলে লেনিনের বিভিন্ন রচনা ও ভাষণের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়ে তাঁর যে মত প্রকাশ পেয়েছে তা অনুধাবন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

বিপ্লবের ঠিক পরেই গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণী / পার্টির দ্বন্দ্ব নিরসনের স্বার্থে লেনিন বহুদলীয়ব্যবস্থাবিরোধী কোনো ভূমিকা নেন নি। বিপ্লবের পরে লেনিন বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব ব্যতিরেকেই, শুধুমাত্র সোভিয়েতগুলোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এক সোভিয়েত দলের হাত থেকে আরেক সোভিয়েত দলের হাতে সরকারি ক্ষমতার হস্তান্তর নিশ্চিত করা হয়েছে।[৯]

মনটি জনস্টোন তাঁর লেখা "সোস্যালিজম, ডেমোক্র্যাসি অ্যানড দি ওয়ান-পার্টি সিস্টেম" নামক নিবন্ধে এ কথা বলেন যে, যুক্তির উপর নির্ভর করে

কখনই বলা যাবে না যে রাশিয়াতে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একদলীয় ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। এই সময় বলশেভিকরা বাম সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিজদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছিল। জনস্টোন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে লেনিনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সম্বন্ধীয় মতামত বহুদলীয় ব্যবস্থার স্বীকৃতির নিদর্শন হিসেবে ধরে নিতে হবে।[১০]

একদলীয় / বহুদলীয় ব্যবস্থার বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর লেখা "সোস্যালিস্ট ডেমোক্র্যাসি অ্যানড দি ওয়ান-পার্টিসিস্টেম" নামক নিবন্ধে এই মন্তব্য করেন যে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাম সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিজ দল পিপলস কমিশারদের কাউন্সিলে সাতটা পদ অধিকার করেছিল।[১১]

উপরের আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা এ কথা বলতে পারি, ১৯১৮ সাল পর্যন্ত লেনিন বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু, ১৯১৯ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে দাঁড়ান। ১৯১৯ সালে তিনি ঘোষণা করেন যে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে এবং এই পথ থেকে সরে আসা সম্ভব নয়।[১২] আমরা যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের দলীয় ব্যবস্থার বিবর্তনের দিকে তাকাই তবে নজর করব যে, ১৯২১ সালের পরে সেখানে একদলীয় ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে দলীয় ব্যবস্থার বিবর্তনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে রয়. এ. মেদভেদেভ লিখেছেন যে, ১৯২০ সালে বাম সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিজ, ম্যাকসিম্যালিস্টস এবং পপুলিস্ট কমিউনিস্টরা পার্টি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করে। ১৯২১ সালে বান্দের (Bund) বাম অংশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিজ, মেনশেভিক এবং অ্যানার্কিস্টরা কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও স্থায়ী সংগঠন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। এই-সমস্ত দলের বহু বামপন্থী বলশেভিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়।[১৩]

দলীয় ব্যবস্থাকে লেনিন কিভাবে দেখেছেন এ কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন লেনিন একদলীয় ব্যবস্থাকে কখনও শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নেন নি। বরং আমরা দেখি যে ১৯২২ সালে লেনিন পুনরায় মেনশেভিকদের আইনসিদ্ধ করার প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[১৪]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: ১৯১৯ সালে লেনিন কেন একদলীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন জানালেন? কেনই বা ১৯২১ সালের পরে একদলীয় ব্যবস্থা কার্যকর হল?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনটি জনস্টোন বলেছেন যে, আমরা যদি ১৯২১ সালের রাশিয়ার অবস্থার দিকে তাকাই তাহলে লক্ষ করব যে সাত বছরের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে স্বাভাবিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে, এই সময়ে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মনে দেখা যায় ক্ষোভ আর হতাশা। এর সাথে যুক্ত হয় মার্চের ক্রনস্তাদ বিদ্রোহ। এই অবস্থায় প্রয়োজন ছিল, যে-সমস্ত দল জনসাধারণকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করছিল তাদের দমন করা।[১৫]

গৃহযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জন মলিনেক্স এই মন্তব্য করেন যে, গৃহযুদ্ধের মারাত্মক প্রভাব দেখা যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে। উৎপাদন আর দক্ষতার স্বার্থে সমস্ত-কিছুর আনুগত্যের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণীর অবক্ষয় প্রকট হয়ে ওঠে। মলিনেক্সের মতে, এই পরিস্থিতিতে একের পর এক বিরোধী দল বেআইনি ঘোষিত হতে থাকে।[১৬]

লেনিন তথা বলশেভিকদের ১৯২১ সালের অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করে আর্নেস্ট ম্যানডে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, গৃহযুদ্ধ চলার সময় বলশেভিকরা

সংবাদপত্রে ও সোভিয়েতে বিরোধিতার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন, কিন্তু যুদ্ধের অবসানে তাঁদের বিচারে ভ্রান্তি ঘটে। ম্যানডের মতে, ১৯২১ সালে ভীতির কারণ বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল না, ছিল শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক উদাসীনতা আর দ্রুত আমলা-তন্ত্রীকরণ।[১৭]

পার্টির একনায়কত্ব এবং সোভিয়েত শাসনের মূল লক্ষ্যের দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করে অসকার অ্যানউইলার এই কথা বলেন যে, সোভিয়েতের ধারণা এবং বলশেভিকদের পার্টির একনায়কত্বের ধারণা ছিল পরস্পরবিরোধী। বলশেভিকরা সর্বতোভাবে সোভিয়েত ধারণার বিস্তার-রোধে সচেষ্ট হয়।[১৮]

লেনিনের লেখায় তত্ত্বগত ত্রুটির উল্লেখ করে পল বেলিস মন্তব্য করেন যে, লেনিনের লেখায় রাজনৈতিক মধ্যস্থতা কিভাবে গড়ে তোলা যায় সেই ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো আলোচনার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বেলিসের মতে, এই অনুপস্থিতি এটাই ইঙ্গিত করে যে লেনিন পার্টি আর শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন বলে ধরে নিয়েছিলেন।[১৯]

লেনিনের চিন্তায় ত্রুটির উল্লেখ করে কারমেন সিরিয়ানি বলেন, লেনিনের পার্টি-সংক্রান্ত তত্ত্ব পার্টি আর শ্রেণীর সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য বলে ধরে নিয়েছে। তাঁর মতে, এই তত্ত্ব ধরে নেয় যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অবিভক্ত বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটায়।[২০]

১৯২১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে র‍্যালফ মিলিব্যানড মন্তব্য করেন, বিশেষ পরিস্থিতির চাপে লেনিন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাকে কখনোই মহিমান্বিত করেন নি।[২১]

লেনিনকে এমন এক অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা দিয়েছিল গৃহযুদ্ধ, শ্রমিকশ্রেণীর গুণগত এবং পরিমাণগত অবক্ষয়, শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর অস্থিরতা, মেনশেভিক আর সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিজদের নিউ ইক-নমিক পলিসির প্রতি বিরূপ মনোভাব, ক্রনস্তাদ বিদ্রোহ, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর বিনাশী কার্যকলাপ। এ-কথা দ্বিধাহীন-ভাবে বলা যেতে পারে যে, এই পরিস্থিতিই লেনিনকে একদলীয় ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে।

এখানে আরো বলতে হবে যে, যদি এ-কথা ধরেও নেওয়া যায় যে বাস্তব অবস্থার বিচারে লেনিন ভুল করেছিলেন, তাহলেও কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে লেনিনকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক এবং রুশ জনসাধারণের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা এবং অর্থ-নৈতিক সংকটের মতো বাস্তব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বাস্তব অসুবিধাগুলোর কথা মাথায় রাখলে লেনিনের অবস্থানকে বিচারের ভ্রান্তির যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া একথা বলাই বাহুল্য, লেনিন যদি এক-দলীয় শাসনব্যবস্থাকে রাজনৈতিক মধ্যস্থতার একমাত্র রূপ হিসাবে দেখতেন তাহলে তিনি অকটোবর বিপ্লবের পর এবং গৃহযুদ্ধের সময় বহুদলীয় ব্যবস্থাকে কখনই মেনে নিতে পারতেন না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, গৃহযুদ্ধের পরও ১৯২১ সাল পর্যন্ত লেনিন বিরোধী দলের কাজকর্ম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেন নি।

সুতরাং এ মন্তব্য করা অবিবেচনার কাজ হবে না যে, লেনিন একদলীয় ব্যবস্থাকে (যা ১৯২১ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে কার্যকর হয়) একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ মতের সমর্থন আমরা পাই ডেভিড হরোউইজের লেখায়। হরোউইজ বলেন যে স্তালিন একটা নতুন সোভিয়েত সংবিধান প্রণয়নের নির্দেশ দেন। এই সংবিধানে একদলীয় ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নীতি রূপে লিপিবদ্ধ হয়। তাঁর মতে, বলশেভিকরা একদলীয় ব্যবস্থাকে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করে-ছিলেন।[২২]

একদলীয় / বহুদলীয় ব্যবস্থার বিতর্কে রোজা লুক্সেমবার্গের অবস্থান নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

রোজা লুক্সেমবার্গের কিছু লেখা পাঠ করে আমরা বলতে পারি যে, তিনি সাংগঠনিক বহুত্বের সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেছেন যে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহের সামগ্রিকতার প্রকাশ ঘটায়।[২৩] অর্থাৎ তাঁর মতে, সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।[২৪]

লুক্সেমবার্গের অবস্থান ব্যাখ্যা করে নর্মান গেরাস এই অভিমত পোষণ করেন যে, রোজা পার্টিকে ঐতিহাসিক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। এই অর্থে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসি রাজনৈতিক বহুত্বের প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু গেরাস বলেন যে, পার্টিকে একই সাথে রোজা সংকীর্ণ অর্থেও দেখেছেন। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গেরাস দেখান যে রোজা সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসিকে 'একক ও সুসংহত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি' হিসাবে গণ্য করেছিলেন।[২৫]

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে রোজা লুক্সেমবার্গ কোনো-কোনো সময় সাংগঠনিক বহুত্বের সমর্থন করেছেন আবার অন্য সময় সাংগঠনিক একত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। লেনিনের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করে একথা বলতে হবে যে, রোজা লুক্সেমবার্গ যে বাস্তব অবস্থার চাপে একদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা বাস্তব সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কখনই বলা যায় না। যতরকম ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে রোজা লুক্সেমবার্গের চিন্তায় অস্বচ্ছতা আছে।

ট্রটস্কি

একদলীয় / বহুদলীয় ব্যবস্থার বিতর্কে ট্রটস্কির ভূমিকা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

ট্রটস্কির কথা আলোচনা করতে গিয়ে জন মলিনেক্স মন্তব্য করেন যে, ট্রটস্কি মেনে নিয়েছিলেন: সোভিয়েত কাঠামোর মধ্যে একাধিক রাজনৈতিক দল দেখতে পাওয়া যাবে।[২৬]

ট্রটস্কির অবস্থান বিশ্লেষণ করে নর্মান গেরাস এই কথা বলেন যে, ট্রটস্কির মতে নতুন সমাজব্যবস্থার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন হবে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। এই দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র মূলধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব নয়, সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যেও এর প্রকাশ ঘটবে। গেরাস বলেন, ট্রটস্কির এই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সাংগঠনিক বহুত্বের পথ উন্মুক্ত করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।[২৭]

এখন মলিনেক্স আর গেরাসের ব্যাখ্যা কতখানি গ্রহণ করা যায়, তার বিচার করতে হলে ট্রটস্কির কিছু লেখার দিকে নজর দেওয়া দরকার। বিপ্লবোত্তর যুগে ট্রটস্কিকে বলতে শোনা যায় যে, যেহেতু এক শ্রেণীর একাধিক অংশ বর্তমান, সেহেতু এক শ্রেণী একাধিক দলের সৃষ্টি করতে পারে।[২৮] এক কাল্পনিক বিপ্লবী দলের কথা উল্লেখ করে ট্রটস্কি মন্তব্য করেন যে, এই দলকে বিভিন্ন সোভিয়েত দলের স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।[২৯] চতুর্থ ইনটারন্যাশানালের (১৯৩৮) প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে উপস্থাপনের জন্য যে কর্মসূচীর দলিল ট্রটস্কি তৈরি করেন, সেই দলিলে একই ভাবে ঘোষণা করা হয় যে বিভিন্ন সোভিয়েত দলকে আইনসিদ্ধ করা না হলে সোভিয়েতগুলোর গণতন্ত্রীকরণ অসম্ভব।[৩০]

কিন্তু এ কথা বলা একেবারেই ভুল হবে যে ট্রটস্কি সাংগঠনিক বহুত্বের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ট্রটস্কির কিছু লেখার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে তিনি সাংগঠনিক একত্বেরও (singularity) সমর্থক ছিলেন। ১৯২৩ সালে ট্রটস্কি ঘোষণা করেন যে, তাঁদের দলই দেশের একমাত্র দল এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়।[৩১] ১৯২৭ সালের "প্ল্যাটফর্ম অব দি জয়েনট অপোজিশন" যাতে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ১১ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন, ঘোষণা করে যে একটা শ্রমিকশ্রেণীর দল হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সারবস্তু।[৩২]

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—একদলীয় / বহুদলীয় ব্যবস্থার বিতর্কে আমরা ট্রটস্কির অবস্থানের পরিবর্তনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব?

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব পরিস্থিতির আলোচনার ভিত্তিতে অনেকে বলতে পারেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতা এবং সোভিয়েত জনসাধারণের নিম্নমানের সংস্কৃতি ট্রটস্কিকে একদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে বলতে হবে যে, সোভিয়েত বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ট্রটস্কির অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা আমাদের কখনই তাঁর সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে না। অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে ত্রিশের দশকে ট্রটস্কির একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থনকে কিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৩৩ সালে মারগারেট ডি সিলভারের কাছে লেখা এক চিঠিতে ট্রটস্কি একটামাত্র রাজনৈতিক দলের বৈপ্লবিক একনায়কত্বকে সমর্থন জানান।[৩৩]

একই সাথে এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, বিপ্লবোত্তর যুগে বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ট্রটস্কি "দ্য রেভেলিউশান বিট্রেড" নামক বইয়ে এই মত ব্যক্ত করেন: দেশের অগ্রগতির স্বার্থে সমালোচনার অধিকার আর নির্বাচনের স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন সোভিয়েত দলগুলোর স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পুনরুত্থান।[৩৪]

সুতরাং এ কথা জোর দিয়েই বলতে হবে যে, একদলীয় / বহুদলীয় ব্যবস্থার বিতর্কে ট্রটস্কির দোদুল্যমানতা তাঁর চিন্তার অস্বচ্ছতারই প্রকাশ।

গ্রামসি

এখন আন্তোনিয়ো গ্রামসি কিভাবে একদলীয় / বহুদলীয় সমস্যাকে দেখেছেন আলোচনা করা যাক।

গ্রামসির কথা আলোচনা করতে গিয়ে অ্যালে শোয়াস্তক সাসুন বলেন, একথা ঠিক যে গ্রামসি পরিষ্কারভাবে বহুত্ববাদী সমাজের কথা বলেন নি কিন্তু তাঁর "নেতৃত্বের" ধারণা রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংগঠনিক বহুত্বের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।[৩৫]

গ্রামসির অবস্থান বিশ্লেষণ করে এ. পোজোলিনি এই মত ব্যক্ত করেন যে, গ্রামসি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কেবলমাত্র একটা দলই একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।[৩৬]

এখন আমরা গ্রামসির লেখার উপর নির্ভর করে তাঁর সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

দলীয় ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রামসি লেখেন যে যদি বিভিন্ন বৈধ দল খুঁজে নাও পাওয়া যায়, বিভিন্ন দল কিন্তু বাস্তবে থাকবেই, এবং বিভিন্ন প্রবণতাকে আইনের উপর নির্ভর করে দমন করা যাবে না।[৩৭] তিনি আরো বলেন যে, যদিও একটা দল একটিমাত্র সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, তথাপি কোনো-কোনো পরিস্থিতিতে কিছু দল একটা-মাত্র সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এই দলগুলো তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী ও অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে থাকে, এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্মতিতে নিজগোষ্ঠীর অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে।[৩৮]

গ্রামসির এই লেখাগুলোর উপর নির্ভর করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সমাজবাস্তবতার অনুভূতিই তাঁকে এ মত প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে বিভিন্ন দল অথবা প্রবণতার বৈধ বা অবৈধ উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

এক্ষেত্রে আমরা গ্রামসির কিছু বক্তব্যের দিকে নজর করব যার উপর ভিত্তি করে তাঁকে অনায়াসে একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

গ্রামসি এই অভিমত পোষণ করেন যে, বর্তমান বিশ্বে বহু দেশে সংগ্রামের প্রয়োজনে বা অন্য কারণে প্রধান দলগুলো বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হতে বাধ্য হয়েছে এবং প্রত্যেকটা অংশ নিজেকে "দল" অথবা স্বাধীন দল হিসাবে ঘোষণা করেছে। মূল বা প্রধান দলের বুদ্ধিজীবীরা কোনো অংশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে এমনভাবে কার্য পরিচালনা করে যাতে মনে হয় যে এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য দলগুলোর উপর অবস্থান গ্রহণ করে তত্ত্বাবধায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।[৩২] এ প্রসঙ্গে এ. পোজোলিনি গ্রামসির লেখা থেকে একটা উদ্‌ধৃতির উল্লেখ করেন। গ্রামসি বলেন যে একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে একটা দল—এই মতের তত্ত্বগত সত্যতা প্রমাণ করতে গেলে বলতে হবে যে চরম পরিবর্তনের ক্ষণে বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বাধীন দল বলে ঘোষণা করেছে, পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটা জোট গঠন করে।[৪০]

গ্রামসির এই বক্তব্যগুলো মাথায় রাখলে দলীয় ব্যবস্থার বিতর্কে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করা খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

একথা ঠিক জোট গঠনের মাধ্যমে গ্রামসি এক-দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনে সচেষ্ট হন, কিন্তু আমরা যদি তাঁর "নেতৃত্বের" ধারণার কথা মনে রাখি তাহলে বলতে হবে যে এই একদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মতের প্রকাশ ঘটবে। জোটের মধ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তির মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠবে সার্বিক ইচ্ছার (collective will) ভিত্তিতে। এই সার্বিক ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটবে বিভিন্ন মতের। জোটের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠবে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে, এ ঐক্য কখনই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। এবং এ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই প্রধান গোষ্ঠী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রামসি বলেন, পূর্বে অঙ্কুরিত বিভিন্ন মতাদর্শ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে কোনো একটা আদর্শ অথবা বিভিন্ন আদর্শ সম্মিলিতভাবে বলবৎ হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক লক্ষ্যের দিক থেকে ঐক্য গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রশ্নের উপস্থাপন করা হয় বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে। এইভাবেই প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী অপ্রধান সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর উপর নেতৃত্বে আসীন হয়।[৪১]

তাহলে উপরের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু দলের বাস্তব উপস্থিতি গ্রামসি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু যখন তাঁকে একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থক হিসাবে দেখতে পাই তখনও দেখা যায় তিনি ঐতিহাসিক জোট গঠনের মাধ্যমে বহু মতের স্থান করে দিতে সচেষ্ট। সুতরাং একথা বলা যায় যে গ্রামসি তাঁর ঐতিহাসিক জোটের ধারণার মধ্যে দিয়ে দলব্যবস্থার আলোচনায় এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। আমরা প্রথমেই বলব যে যদিও মার্কস এবং অধিকাংশ প্রথিতযশা মার্কস-বাদীদের মধ্যে দোদুল্যমানতা ও অস্পষ্টতা পরিষ্কার-ভাবে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহলেও একথা বলা যাবে না যে তাঁরা বহুদলীয় ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রে একমাত্র স্তালিন এবং লুকাস দৃঢ়ভাবে একদলীয় ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। স্তালিনই প্রথম একদলীয় ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিলেন। সুতরাং আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, বহুদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে হাঙ্গেরি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এ কথা কখনোই বলা যাবে না।

References

1. Bhabani Sen Gupta, 'Change in Hungary ; A Multi-party Set-up ?', The Statesman, March 7, 1989, p 6.
2. Mary Dejevsky, 'Winds of Change-I : Gorbachov Lets The People Speak', The Statesman, April 7, 1989, p 8.
3. Richard N. Hunt, The Political Ideas of Marx and Engels, Volume II, pp 193-4, 197-9.
4. Monty Johnstone, 'Socialism, Democracy and the One-Party System (Part One)', Marxism Today, Volume XIV, No. 8, August 1970, pp 244-5.
5. 'Marx to Ferdinand Domela Nieuwenhuis in the Hague, London, February 22, 1881', MESC, p 318.
6. Quoted in Hal Draper, 'Marx and the Dictatorship of the Proletariat', New Politics, Volume I, No. 4, p 95.
7. Karl Kautsky, The Dictatorship of the Proletariat, pp 45-6.
8. Ibid., p 1.
9. 'From the Central Committee of the Russian Social-Democratic Labour Party (Bolsheviks) : To All Party Members and to All the Working Classes of Russia', LCW, Vol. XXVI, p 303.
10. Monty Johnstone, 'Socialism, Democracy and the One-Party System (Part Two)', Marxism Today, Volume XIV, No. 9, September 1970, pp 281-2.
11. Buddhadeva Bhattacharyya, 'Socialist Democracy and the One-Party System', Teaching Politics, Volume XII, Nos. 2 & 3, 1986, pp 4-5.
12. Quoted in E. H. Carr, The Bolshevik Revolution, 1917-1923, Volume I, p 236.
13. Roy A. Medvedev, Let History Judge : The Origins and Consequences of Stalinism, pp 381-2.
14. Buddhadeva Bhattacharyya, 'Socialist Demoaracy and the One-Party System', op. cit., p 14.
15. Monty Johnstone, op. cit., Volume XIV, No. 11, pp 349-50.
16. John Molyneux, Leon Trotsky's Theory of Revolution, pp 70-1.
17. Ernest Mandel, Revolutionary Marxism Today, pp 31-2.
18. Oscar Anweiler, The Soviets : The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905-1921, p 252
19. Paul Bellis, Marxism and the USSR : The Theory of Proletarian Dictatorship and the Marxist Analysis of Soviet Society, pp 39-40, 81-2. (italics in original).
20. Carmen Sirianni, Workers' Control and Socialist Democracy : The Soviet Experience, p 62.
21. Ralph Miliband, Marxism and Politics, p 143.
22. David Horowitz, Imperialism and Revolution, pp 157-8. (italics in original).
23. 'Organizational Questions of Russian Social Democracy', in Dick Howard (ed. & intro.), Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, p 287.
24. Ibid., p 303.
25. Norman Geras, 'Classical Marxism and Proletarian Representation', New Left Review, No. 125, January-February 1981, pp 84-5, 88-9.
26. John Molyneux, op. cit., p. 71.
27. Norman Geras, op. cit., pp 84-5.
28. Leon Trotsky, The Revolution Betrayed : What is Soviet Union and where is it going ? p 252.
29. Ibid., p 230.
30. Leon Trotsky, The Transitional Programme : The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International, p 56. (Emphasis in original).
31. Leon Trotsky, The New Course, p 27,
32. Leon Trotsky et al, The Platform of the Joint Opposition, 1927, p 113.
33. 'A Letter to Margaret de Silver' in Writings of Leon Trotsky, 1936-37, p 513.
34. Leon Trotsky, The Revolution Betrayed, op. cit., p, 273.
35. Anne Showstack Sassoon, Gramscis's Politics, p 230.
36. A. Pozzolini, Antonio Gramsci, An Introducation to his Thought, p 82.
37. 'The Modern Prince', SPN, p 149.
38. Ibid., p 148.
39. Ibid.
40. Quoted in A Pozzolinl, op. cit., p. 82.
41. 'The Modern Prince', op. cit., pp 181-2.

Abbreviations

LCW—V. I. Lenin, Collected Works
MESC—Marx Engels, Seleted Correspondence
SPN—Selections from the Prison Note Books of Antonio Gramsci

২

"মিথাইলগোরবাচেভ কি আদৌ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা ?"

"চতুরঙ্গ"র জুন ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত মিহির মিশ্রের "মিথাইল গোরবাচেভ কি আদৌ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা ?" নামক প্রবন্ধ পাঠ করলাম। এই প্রবন্ধ পাঠের পর কিছু মন্তব্য করা সমীচীন বলে মনে করছি।

মিহিরবাবু গোরবাচেভের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন আর স্তালিনের সম্পর্ককে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা তাঁদের সময়কার সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা এবং লেনিনের মতবাদের উপর নির্ভর করে পুরোপুরি মেনে নেওয়া খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে।

মিহিরবাবু লিখেছেন : 'ক্ষমতা দখলের পর থেকে লেনিন আর স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি গৃহযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটকালের বছরগুলি ও তার ফলজনিত ধাক্কা সামলাবার বছরগুলি বাদ দিলে সাংস্কৃতিক, আদর্শগত···চেতনার বিকাশের কাজে বিশেষ···নজর দেওয়ার সময় প্রায় পান নি।' (পৃ ১৭২)

মিহিরবাবুর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলতে হবে যে, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত চেতনা বিকাশে বিশেষ মনোযোগ দিতে না পারলেও লেনিন এবং স্তালিন কিন্তু একই ভূমিকা পালন করেন নি। লেনিন বাস্তব পরিস্থিতির নানারকম বাধা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত চেতনার বিকাশে কিছু কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন। উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করার স্বার্থে লেনিন "কমিউনিস্ট সাবটনিক্স"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আমরা বর্বরতা এবং ঘুষ জাতীয় দুষ্ট ক্ষতের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছি' (স. র., খণ্ড ৩৩, পৃ ৭৭)। আবার দেখি যে, ১৯০২ সালে লেনিন শুধুমাত্র পেশাদার বিপ্লবীদের দল তৈরি করার পক্ষপাতী থাকলেও ১৯০৫ ও ১৯১৭-২০ সালে পার্টির গণচরিত্র-প্রদানে সচেষ্ট হন। কিন্তু একথা বলতে হবে যে, লেনিন কখনও পার্টির আদর্শগত পবিত্রতা রক্ষার কথা ভুলে যান নি। এই পবিত্রতা রক্ষায় তিনি পার্টির মধ্যে আদর্শগত সংগ্রামের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন : 'প্রত্যেক বুদ্ধিশীল পার্টিতে অস্থির, দোদুল্যমান আর দ্বিধাগ্রস্ত উপাদান সব সময়ই দেখা যাবে। কিন্তু এই উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করা যাবে। এই উপাদানগুলি দৃঢ়বদ্ধ এবং সংহত সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট কোর-এর প্রভাবের বশবর্তী হবে।' (স. র., খণ্ড ১০, পৃ ৩২)। এই আদর্শগত সংগ্রামের বাস্তব রূপায়ণের কথা মাথায় রেখেই লেনিন-অনুমোদিত 'ঐক্য প্রস্তাব'-এ "ডিসকাশন বুলেটিন" প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে যদি স্তালিনের অবস্থানের পর্যালোচনা করি, তাহলে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্তালিন আর লেনিনের পার্থক্য স্পষ্টই লক্ষ করব। বিপ্লব-পরবর্তী যুগে স্তালিন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নি। তিনি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবেই দেখেছিলেন। এই কারণে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা আমরা স্তালিনের মধ্যে দেখতে পাই না। আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার স্বার্থে স্তালিন পার্টির অভ্যন্তরে গণ-তান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন : 'লৌহশৃঙ্খলা পার্টির ভিতরে সমালোচনা ও মতপার্থক্য নিবারিত করে না, আগেই স্বীকার করে নেয়' (লেনিনবাদের ভিত্তি, পৃ ১১৭)। এ সচেতনতার উল্লেখ আমরা মিহিরবাবুর লেখার মধ্যেও পাচ্ছি যখন তিনি বলছেন : 'ফেবরুয়ারি ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির মধ্যে কী ভাবে গণতন্ত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে তার বিবরণ জ্দানভের কাছ থেকে শোনে এবং তার প্রতিষেধক পদক্ষেপের কথা আলোচনা করে' (পৃ ১৭৬)। কিন্তু এখানে একথা উল্লেখ করতে বাধা নেই যে, স্তালিন পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তিনি পার্টির ভিতরে শুধু উপদলই নিষিদ্ধ করেন না, তিনি 'ঐক্য প্রস্তাব'-এর এমন ব্যাখ্যা দেন, যাতে যে-কোনো রকমের সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁর সময়ে "ডিসকাশন বুলেটিন" প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, স্তালিন আদর্শগত চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর পন্থা উদ্ভাবনে ব্যর্থ হন।

মিহিরবাবু লিখেছেন : 'লেনিন তত্ত্বগতভাবে অনেক আগেই দেখেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার কালে শ্রেণীসংগ্রাম অবলুপ্ত হয়ে যায় না' (পৃ ১৭৩)। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে তিনি স্তালিনকে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব থেকে বাস্তব রূপকার,···ও মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের শিরোমণি তাত্ত্বিক' (পৃ ১৭২) হিসেবে দেখেছেন। আমার প্রশ্ন: বিপ্লবোত্তর সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নে স্তালিন আর লেনিন কি একই ভূমিকা নিয়েছিলেন? বিপ্লবোত্তর যুগে লেনিন যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, স্তালিন সেখানে বিভিন্ন বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রেণীর উপস্থিতির ও শোষকশ্রেণীর অবলুপ্তির স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে এই সময়কার সমাজের এক নতুন অর্থ সংযোজিত করেন। (দ্র. অন দ্য ড্রাফট কনস্টিটিউশন অব দি ইউ.এস.-এস.আর. অ্যান্ড কনস্টিটিউশন [ফানডামেনটাল ল] অব দি ইউ.এস.এস.আর., পৃ ২২, ৪৫)

মিহিরবাবু লিখেছেন : 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সংস্থাগত প্রশাসনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি ছিল না ; যার অনিবার্য পরিণতি বেশ খানিকটা রেজিমেনটেশন বা সামরিকীকরণ' (পৃ ১৭৪)। এখানে একথা উল্লেখ করা দরকার যে, সংস্থাগত প্রশাসনের ওপর নির্ভরতা সত্ত্বেও লেনিন কিন্তু আমলাতান্ত্রিকতার উদ্ভব-রোধে কৃতসংকল্প ছিলেন এবং ভবিষ্যতে গণ-শাসন প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন। পার্টির ভেতরে আর বাইরে আমলা-তান্ত্রিকতার উদ্ভবরোধে লেনিন বিভিন্ন উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন। তিনি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজানটস ইনসপেকশন, কনট্রোল কমিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্যে দিয়ে আমলাতন্ত্রকে রোধ করায় প্রয়াসী হন। এ ছাড়া, নন-পার্টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজানটস কন-ফারেন্সেস এবং বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তিনি জনগণকে প্রশাসনিক কাজকর্মের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চান এবং ধীরে-ধীরে গণশাসন প্রবর্তনে আগ্রহী হন। এখানে বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, স্তালিনের শাসনকালে আমরা কিন্তু লেনিন-উদ্ভাবিত এইসমস্ত ব্যবস্থার কোনো কার্যকর ভূমিকাই দেখতে পাই না।

মিহিরবাবু উল্লেখ করেছেন : 'গৃহযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী পরিস্থিতির মধ্যেও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির স্তালিনকালীন নেতৃত্ব সাফল্যের সঙ্গে···পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে লেনিনীয় নীতির প্রতিষ্ঠা,···সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছে' (পৃ ১৭৪)। এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, লেনিন কিন্তু তাঁর নীতি শুধুমাত্র পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। পার্টির সিদ্ধান্তের সঙ্গে পার্টির সাধারণ সদস্যদের যুক্ত করার মানসে তিনি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও পার্টির মধ্যে ব্লক গঠন, ডিসকাশন বুলেটিন (যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে) প্রকাশ প্রভৃতির পক্ষে দাঁড়ান। স্তালিনের পার্টি-কাঠামোর দিকে নজর করলে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি পার্টির কেন্দ্রী-করণের উপর অসম্ভব জোর দেন। আর লেনিনের পার্টি ছিল একটি চলমান প্রতিষ্ঠান। পরিবর্তনশীল বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেনিন কোনো সময় কেন্দ্রিকতা আর কোনো সময় গণতন্ত্রের নীতির

ওপর জোর দিয়েছেন। লেনিন যেখানে পার্টির অভ্যন্তরে নেতৃত্ব এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, স্তালিন পার্টির কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টায় এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক-স্থাপনে ব্যর্থ হন। এ সূত্রে একথা বলা যেতে পারে যে, স্তালিন 'মার্কসবাদে শিক্ষিত করে তোলার' (পৃ ১৭১) ওপর জোর দিলেও লেনিনের মতো দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আদর্শগত চেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি।

মিহিরবাবু মন্তব্য করেছেন : 'লেনিনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার তুঙ্গে থেকেও একটি কথা বলেন নি, যদিচ সেটা বলার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল' (পৃ ১৭৭)। এ মন্তব্য প্রসঙ্গে বলব যে, লেনিনের টেস্টামেন্ট যখন উপস্থাপিত হয়, তখন স্তালিন সবেমাত্র পার্টির নেতৃত্বে নিজের ক্ষমতাকে সংহত করছেন। সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে যাওয়া এবং একই সাথে পার্টির ভেতরে সমস্ত বিরোধীদের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো সাহস আর ক্ষমতা—কোনোটাই স্তালিনের ছিল না।

মিহিরবাবু আবার বলেছেন : 'ভুলে গেলে চলবে না—লেনিন মানুষ, দেবতা নন। তাঁর তাত্ত্বিক নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্তালিন' (পৃ ১৭৭)। এ মত মেনে নেওয়া খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে যখন আমরা দেখি যে, স্তালিন অনেক ক্ষেত্রেই লেনিন-অনুসৃত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। যখন স্তালিন ঘোষণা করেন যে, 'ক্যাডাররাই সবকিছু নির্ধারণ করেন' তখন একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যেখানে লেনিন পার্টির নেতৃত্ব, ক্যাডার এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করেন, সেখানে স্তালিন শুধুমাত্র ক্যাডার-নির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়ে এক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটান। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্তালিন বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সমাজে বিভিন্ন মিত্রশক্তির উপস্থিতি এবং শোষক-শ্রেণীর অনুপস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্তালিনের এই অবস্থান এটাই প্রমাণ করে যে, ক্ষণিক বিচ্যুতি ও তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা সত্ত্বেও যেখানে লেনিন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে (বিপ্লবোত্তর যুগেও) এবং পার্টি ও শ্রেণীর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন সেখানে স্তালিন এই সম্পর্ক অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার আমরা দেখি যে স্তালিন বলেন : 'কারিগরি জ্ঞান সবকিছু নির্ধারণ করে।' আমরা একথা দ্বিধাহীন-ভাবেই বলতে পারি যে, উৎপাদিকা শক্তির উপর স্তালিনের অতিরিক্ত নির্ভরতা তাঁকে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল করে ফেলে, এবং সামাজিক পরিবর্তনে জনগণের ভূমিকাকে তিনি উপেক্ষা করেন। কিন্তু লেনিন সামাজিক পরিবর্তনে রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেই আমরা দেখতে পাই, যেখানে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতারক্ষায় কৃতসংকল্প সেখানে স্তালিন তত্ত্বগত-ভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলির আংশিক স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ান এবং বাস্তবে ১৯৩৩ সালে এগুলিকে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করেন।

মিহিরবাবু লিখেছেন : '(স্তালিন পার্টি-বিচ্ছিন্ন কোনো "ঐশ্বরিক" ক্ষমতাবান নন, তিনি যদি "বিপথে" গিয়েও থাকেন, তাহলে তার দায় লেনিনের ও সমগ্র পার্টির)' (পৃ ১৭৯)।

আমার প্রশ্ন : মিহিরবাবু কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে এ ধরনের মন্তব্য করলেন? একথা ঠিক যে, লেনিন যদি পার্টির অভ্যন্তরে উপদল নিষিদ্ধ না করতেন, পার্টির মধ্যে সেক্রেটারিয়েট, অর্গব্যুরো, পলিটব্যুরো প্রভৃতি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করতেন, একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন না করতেন, তাহলে স্তালিনের পক্ষে পার্টির অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ হয়তো সম্ভব হত না, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, একই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে থেকে যেখানে লেনিন নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট,

সেখানে স্তালিন গণতান্ত্রিক আদর্শকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা দেখি যে, ১৯২১ সালে লেনিন পার্টির অভ্যন্তরে উপদল নিষিদ্ধ করলেও, বিরোধিতা বা সমালোচনার অধিকার থেকে কিন্তু পার্টি-সদস্যদের বঞ্চিত করেন নি। অন্যদিকে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্তালিন 'ঐক্য প্রস্তাব'-এর এমন ব্যাখ্যা দেন যার ফলে পার্টির অভ্যন্তরে সব-রকমের বিরোধিতা নিষিদ্ধ হয়। একই সময়ে লেনিন পার্টির প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর করলেও তিনি কখনোই চান নি যে পার্টি আমলা-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক। এই কারণে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন, যেমন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিস্তার, পার্টি-সদস্য ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণের দ্বারা পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। (এর কিছু উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।) স্তালিনের শাসনকালে আমরা এইজাতীয় কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থারই প্রয়োগ দেখতে পাই না। ১৯২১ সালের পরে বিশেষ পরিস্থিতিতে লেনিন একদলীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করলেও একথা কিন্তু অস্বীকার করা চলবে না যে, ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুদল-ব্যবস্থা কায়েম রেখেছিলেন। স্তালিন কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ (essential adjunct) হিসাবে দেখেন। লেনিন পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একই সাথে বিচ্ছেদ আর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্তালিন এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নতাই স্থাপন করেছেন। পার্টির শুদ্ধিকরণ-কাজে যেখানে লেনিন পার্টির নেতৃত্ব, সাধারণ সদস্য, এমনকী পার্টি-বহির্ভূত জনগণের উপর নির্ভর করায় আগ্রহী ছিলেন, সেখানে স্তালিন এই কাজে শুধুমাত্র নেতৃত্ব বা পার্টির প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করেছিলেন।

মিহিরবাবু মন্তব্য করেছেন : 'স্তালিন মারা গেছেন পঁয়ত্রিশ বছর। তথাপি তিনি সোভিয়েত জনমানসে এতই প্রবল' (পৃ ১৭৯)।

এ প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হবে যে, স্তালিনের প্রভাবের আলোচনা সবসময়ই বিতর্কের সৃষ্টি করবে। কিন্তু এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, স্তালিন তাঁর সময়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং দমননীতির আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও যদি জনসমর্থন না পেতেন তবে কখনোই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারতেন না। তাঁর জন-সমর্থন লাভের কারণ হিসাবে আমরা লেনিন-অনুসৃত কৃষিতে কলেকটিভাইজেশন এবং শিল্পায়নের নীতি অনুসরণে তাঁর সফলতা এবং তাঁর প্রতি একটি মোহ-জাল সৃষ্টি করার ক্ষমতাকেই নির্দেশ করতে পারি। অবশ্য একথা অস্বীকার করা মুশকিল যে, সোভিয়েত জনগণের এবং পার্টি-সদস্যদের পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক চেতনার উপর ভিত্তি করেই তিনি এই মোহজাল সৃষ্টি করেছিলেন।

উপরের আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে, মিহিরবাবু যেভাবে গোরবাচেভের মূল্যায়ন করেছেন তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া অসুবিধাজনক।

কিন্নরকথা

কিন্নরের বিবাহরীতি ও বহুভর্তৃকপ্রথা

কিরণশঙ্কর মৈত্র

এক

হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা থেকে কিন্নর জেলার প্রধান শহর কল্পা ১৭০ মাইল দূরে। কিন্নরের কেন্দ্রস্থলে এই শহরটি সমুদ্রতল থেকে ন হাজার ফুট উঁচুতে।

কিন্নরলোকের উত্তরে হিমাচলের অন্যতম জেলা লাহুল-স্পিতি, দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশ, শিমলা জেলা পশ্চিমে এবং পূর্ব সীমান্তে তিব্বত-চীনদেশ। বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে এই সীমান্ত-সংযোগের জন্যে প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে কিন্নরের গুরুত্ব যথেষ্ট। তাই "ইনার লাইন পারমিট" নিয়ে কিন্নরলোকে প্রবেশের কড়াকড়ি।

১৯৬০ সালের ১লা মে পূর্বতন হিমাচলের মাহাশু জেলার চিনি তহশিল নিয়ে কিন্নর জেলাটি নতুন করে সংগঠিত হয়।

কিন্নর জেলায় তিনটি মহকুমা—নিচার, কল্পা আর পুহ্। কল্পা এবং পুহ্‌কে আবার দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। কল্পায় সাঙলা এবং কল্পা তহশিল, আর পুহ্‌তে পুহ্ আর মুরাঙ তহশিল এবং হাঙরাঙ উপ-তহশিল।

গোটা জেলার আয়তন ৬,৫২০ কিমি। ৭৭টি গ্রাম নিয়ে এই জেলার জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কিন্নরের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী, তাতে প্রধান ভূমিকা মহিলাদের।

প্রধান ফসল ভুট্টা, বাজরা, গম, যব, আলু ইত্যাদি। তবে কিন্নরের খ্যাতি হল চিলগোজা ফলের জন্যে। আপেল, আঙুর, পিচ, প্লাম, এপ্রিকট, আলমনড, জিরা—এসবও এলে। পশুপালন আর-একটি প্রধান উপজীবিকা। ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর পালন অনেকের উপার্জনের প্রধান উৎস।

প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ন কিন্নরের সর্বপ্রথম রাজা। এবং সেই বংশধারার সবশেষ ১২২তম উত্তরাধিকারী হলেন রাজা বীরভদ্র সিং—যিনি ছিলেন লোকসভার সদস্য এবং বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ "অমরকোষে" কিন্নর বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধর্ব শব্দগুলির উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণ-কাহিনীতে কিন্নর-গন্ধর্বদের বর্ণনানুযায়ী তারা নৃত্যগীতপ্রিয়। "কুমারসম্ভব" কাব্যের চার-পাঁচটি শ্লোকে কিন্নরলোক আর কিন্নর-কিন্নরীদের স্বপ্নসুষমামণ্ডিত বর্ণনা। প্রথম সর্গের একাদশ-সংখ্যক শ্লোকে পড়ি—যেখানে কিন্নরীরা পায়ের আঙুল আর গোড়ালিতে ব্যথা সত্ত্বেও পথের উপর পাথরের মতো বরফের উপর, ভারী স্তন আর নিতম্বের ভারসাম্যে আপন স্বাভাবিক মন্দ-মন্থর গতিতে পথ চলে। তাদের মুখাকৃতি অশ্বের মতো।

উত্তরহিম-ভারতীয় এই অনন্য পার্বত্য জনজাতির বিবাহ-প্রথাও বিস্ময়কর।

দুই

কিন্নরে চার ধরনের বিবাহ—"যানেটাঙ" বা "যানেকাঙ" —যার অর্থ হল বিবাহ; "যানেটাঙ" সহজ-সরল সাধারণ বিবাহরীতি। দ্বিতীয়ত—"ডাম টাঙশিস" বা "বেনাঙ হাচিশ" অর্থাৎ প্রণয়জ বিবাহ, লাভ ম্যারেজ। তৃতীয়ত—"নারোশ" বা "ভাবডাব" বা "খুচিস" অর্থাৎ জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ, এবং চতুর্থত—"হর" যার সোজা অর্থ অন্যের স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে বিবাহ। "হর" শব্দটির মধ্যে 'হরণ' শব্দটির তাৎপর্য নিহিত।

যানেটাঙ কিন্নরের একমাত্র সাধারণ বিবাহরীতি। ছেলের বাবা কোনো উপযুক্ত মেয়ের সন্ধান পেলে বুদ্ধিমান কোনো আত্মীয়কে পাত্রীর মা-বাবার কাছে কথাবার্তার জন্যে পাঠায়। মেয়েপক্ষ বিবাহপ্রস্তাবে রাজি হলে দুজন "মাজোম" (ঘটক, মধ্যস্থ ব্যক্তি) পাঠায় এক বোতল "ছাঙ" (স্থানীয় মাদক পানীয়, কিন্নরে যব দিয়ে তৈরি হয়) এবং পাঁচটি টাকা দিয়ে মেয়ের বাড়িতে। একটি সোনার গহনা (যাকে "বুনি" বলে) দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করে বিবাহপ্রস্তাব পাকা করা হয়। এরপর বিয়ের দিন ধার্য হয়। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে লামা এই দিন ধার্য করেন। অগ্রহায়ণ মাস শুভ বলে গণ্য।

বিয়ের দিন রাতে পাত্র বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং "মাজোম" নিয়ে জন দশেকের একটি বরযাত্রীর দল কনের বাড়িতে যায়।

সব ভাইই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে, কিন্তু বিবাহ করতে যায় ভাইদের মধ্যে সে, যে পাত্রীর সমবয়সী। তার পরনে থাকে ছুবা (লম্বা কুর্তা), গাছাঙ (কোমরবন্দ, লম্বা সরু কাপড়ের টুকরো), টাপ্রু-সে-চান্‌লি (নকশাকরা চাদর), টাপ্রু-সে-সুতান (নকশাকরা পাজামা), টাপ্রু-সে-বল্‌জান্থু স্পোনা (কারুকাজকরা জুতো) এবং কোমরে গোঁজা ছোরা। আথিক সঙ্গতি থাকলে সুসজ্জিত ঘোড়ার পিঠে চেপে বিয়ে করতে যায় এবং সঙ্গে বসন-ভূষণে সাজিয়ে আরও একটি ঘোড়া নিয়ে যায় নববধূকে নিয়ে আসবার জন্যে।

বরযাত্রীরা কনের বাড়িতে পৌঁছলে যদি তাদের সঙ্গে কোনো ভূতপ্রেত এসে থাকে (কিন্নরবাসী ভূত-প্রেত আর নানা সংস্কারে বিশ্বাসী) লামা মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক করে তাদের তাড়িয়ে দেন। বরযাত্রীদের আবাহন জানাবার জন্যে প্রবেশদ্বারে জ্বলে সুগন্ধি ধূপ, ঘরের মধ্যে শস্যভরা ঘড়ার উপরে প্রদীপ।

ভোজের আয়োজনে থাকে মাংস, ভাত, রুটি, ঘি আর ছাঙ (বা আরক)। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে কনের আত্মীয়েরা একটি ঘরে জমা হয়। পাত্রপক্ষ তাদের সবাইকে মাল্যভূষিত করে, সম্মান জানায় যথাযোগ্য অর্থ উপহার দিয়ে। এই "সেলিঙ কুলু" অনুষ্ঠানে পাত্রীপক্ষের নতুন কুটুম্বদের সঙ্গে পাত্রের পরিচয় হয়। পাত্র তার শাশুড়িকে সম্মান জানায় কৃতাঞ্জলি হয়ে, "নজরানা" (সম্মান-দক্ষিণা) দেয় অবস্থানুযায়ী পাঁচ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। একে বলে "যুমেডালিয়াঙমিগ"।

সমাপ্ত হল শুভবিবাহ।

তবে আরও দু-একটা অনুষ্ঠান রয়েছে। যেমন—বরকনের বিদায় নেবার আগে একটি সমবেত নৃত্য-গীত—যার নাম "মনছাঙ ফ্রোলশিমু"। বয়োবৃদ্ধ মাজোমি এই অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা নেয়। তার ডান হাতে ধরা থাকে ছাঙভরা বোতল, পেছনে কনে এবং অন্যান্যরা। এরপর বরকনেকে বিদায় দেবার পালা।

পাত্রপক্ষ "দাগলো" (রুপোর চুড়ি) ছাড়া আর সব গহনা দেয় নববধূকে, দাগলো দেয় কনের মা-বাবা। কনেকে সুন্দর করে সাজানো হয় টাপ্রু-সে-ধোরি (মেয়েদের পরিধেয় লম্বা ঝুলপোশাক), টাপ্রু-সে-সুতান (সুন্দন ডিজাইনকরা সালোয়ার), গাছাঙ (কোমরবন্দ), টাপ্রু-সে-স্পোশ (নকশাকরা জুতো), চোলি আর প্রিপেথাঙ (মাথার পশমের গোল টুপি) দিয়ে। বরকনের আগে-আগে থাকে গায়ক-বাদকের দল।

গান-বাজনাসহকারে তারা বরকনে নিয়ে এগোতে থাকে, কিন্তু রাস্তায় কোনো দেব-দেবীর মন্দির পড়লে

বাজনা থামিয়ে দেয়, পথে কোনো ব্রিজ পড়লে সেখানে ছাঙ ছিটিয়ে দেয়। এটা করা হয় ভূত-প্রেত-দুষ্ট আত্মাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে—যারা ব্রিজের কাছাকাছি থাকে বলে কিন্নরদের বিশ্বাস।

বরের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলে কনের গ্রামের যেসব মেয়ের এই গ্রামে আগেই বিয়ে হয়েছিল তারাই এসে নববধূকে প্রথমে স্বাগত জানায়। কনের বাড়িতে বরপক্ষকে বিয়ের দিন যেমনভাবে আবাহন করা হয়েছিল, সেইরকম অনুষ্ঠান হয়। বরের মা বরকনেকে বরণ করে ঘরে নিয়ে যায়। তারপর ভোজের জন্যে একটি বড়োসড়ো ছাগলের শিরশ্ছেদ করা হয় অতি সাবধানে। কারণ, ছাগলের অন্য অংশ কেটে-ছিঁড়ে গেলে সেটাকে অশুভ লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়।

কিন্নরের সব জায়গাতেই বিবাহানুষ্ঠান এই একই-ভাবে পালিত হয় না। তিব্বত-সন্নিহিত হাঙরাঙ এলাকার রীতিনীতি একটু আলাদা। কিন্নরের উঁচু এলাকায় যেখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বাস করে সেখানে দরজার সামনে লামা দাঁড়িয়ে থেকে মন্ত্র পড়ে, নববধূকে ঘরে নিয়ে যায়। একে বলে গিয়াস্‌টোক।

পরের দিন প্রাতরাশে নুন, মাখন আর ফলের গুঁড়ো মেশানো নোনতা চা পরিবেশন করার পরে "উ-পাগে" অনুষ্ঠান। নববধূর সমস্ত স্বামীদের মাথায় এই অনুষ্ঠানে "পাগ" (পাগড়ি) পরিয়ে দেয় তাদের মামা। তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় নিয়েজা, বিজা, খোবানি, এপ্রিকট বা ওয়ালনাটের মালা। এই অনুষ্ঠানের পরেই নববধূ অন্য ভাইদের সঙ্গেও বিবাহিতা বলে গণ্য এবং সমবেতভাবে তাদের স্ত্রী বলে গৃহীত হয়।

পাত্রের বাবা বধূর নামে আলাদা একটুকরো জমি উইল করে লিখে দেয়। মাজোমিরা এই দলিলের সাক্ষী থাকে। সাধারণত কনের বাবাএই দলিল রেখে দেয়। বধূকে যেসব বাসনপত্র দেওয়া হয় তার ফর্দ বানানো হয়। বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলে এই সমস্ত-কিছু আবার কনেকে বা তার বাবাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এর পরে "বেল্‌ডিঙ শমর" অনুষ্ঠান। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী এবং বরের আত্মীয়স্বজন এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। তারা কেউ টাকা, কেউ কাপড়, কেউ বা শস্য উপহার দেয় বরকে।

উপহার দেওয়া হয় এক থেকে একশো টাকা আর পাঁচ থেকে চল্লিশ ব্রেজা (কিন্নরী ওজন) শস্য। যেসব কাপড় উপহৃত হয় তার মধ্যে থাকে "চোরি"। (silver hook), ছাল্‌লি (চাদর) আর চোলি।

ওই দিন সন্ধেয় "বিয়োশিমিগ" অনুষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ-উৎসবের সমাপ্তি। কনের সঙ্গে তার যেসব আত্মীয়স্বজন এসেছিল তারা তাকে যথাসাধ্য অর্থ-উপহার দিয়ে বিদায় নেয়। এটা কনের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে নববধূ তার বাপের বাড়ির আপনজনদের বিদায় জানায়।

বিয়ের মাসখানেক পরে নববধূ বাপের বাড়ি যায়, ফিরে আসে সাধারণত বছর খানেক পরে।

একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য : কিন্নরের হিন্দু বিবাহে অগ্নিপ্রদক্ষিণ ইত্যাদি বৈদিক অনুষ্ঠান অনুপস্থিত।

কিন্নরে ব্রাহ্মণ নেই—যদিও সেখানে প্রায় সবাই হিন্দু। দশ শতাংশ সম্ভবত বৌদ্ধ। এ ছাড়া আছেন কানেৎ আর জাড—যাঁরা নিজেদের রাজপুত বলেন।

রয়েছেন চামাঙ যাঁদের পেশা জুতো বানানো বা কাপড় বোনা, আর ডোমাঙ হল কর্মকার।

চামাঙ এবং ডোমাঙদের সাধারণত অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা নেই। কানেৎ আর জাডদের মধ্যে ভেদবিভাগ আছে।

কিন্নরের বর্তমান অধিবাসীদের একটি বিরাট অংশ আদিবংশোদ্ভূত। অধস্তন পুরুষক্রমে বহিরাগত-দের সঙ্গে মেলামেশা করছে। হিন্দুদের মধ্যে একাধিক আলাদা সম্প্রদায় থাকলেও কিন্নরে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

তিন

ডাম টাঙশিস বা প্রেমবিবাহ খুবই সহজ সরল। এই বিবাহ হয় যেখানে ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে আগে থাকতেই ভাব-ভালোবাসা থাকে। যদি পরিবারের হাওয়া অনুকূল থাকে, ছেলেটি সরাসরি প্রাণেশ্বরীকে নিয়ে বাড়িতে আসে। তারপর পাত্রপাত্রীর অভিভাবক-দের মধ্যে কথাবার্তা আর শুভবিবাহ।

যদি পরিবারের সম্মতি না থাকে তা হলে প্রেমিকপ্রবর একটু অসুবিধেয় পড়ে, কিন্তু পেছিয়ে যায় না। এই বিবাহে পাত্রপক্ষের সাধারণত অসম্মতি থাকে না, বাধা আসতে পারে মেয়ের পক্ষ থেকে।

যদি অবস্থা অনুকূল না হয়, ছেলেটি তার প্রণয়িনীকে নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করে, ছেলের বাবা ছাঙ-এর বোতল দিয়ে মাজোমি পাঠায় মেয়ের বাড়িতে। হয়তো উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই ব্যাপারের শুভ-পরিণতি ঘটে। নয়তো প্রণয়ী-যুগলকে নিজ-নিজ পথে যুদ্ধ করে যেতে হয় প্রেমের মূল্য দেবার জন্যে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্নর-সমাজ এই বিবাহ মেনে নেয়।

হাঙরাঙ অঞ্চলে প্রেম-বিবাহকে বলে "খিনঢুপ"। প্রেমিকপ্রবর যখন তার হৃদয়-রানীকে নিয়ে হাওয়া —আত্মীয়স্বজন এক সময়ে তাদের খুঁজে বার করে। এখানেও মাথাব্যথা ছেলের বাপের। সে মাজোমি পাঠায় মেয়ের বাড়িতে। এখানে তার ভূমিকা শান্তি-দূতের মতো। তাকে রাজদূতের মতো শিষ্টাচারী, মধুরভাষী ও কূটকৌশলী হতে হবে। সে ছাঙ ও 'খটক' (একখণ্ড সাদা কাপড়) নিয়ে কনের বাড়িতে যায়। খটক নীচু করে টানিয়ে দিয়ে ছাঙ-এর বোতল রেখে দেয় "চোকচে" নামে টেবিলের নীচে। তারপর করজোড়ে কনেপক্ষের কাছে আনুপূর্বিক ঘটনার বর্ণনা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ছেলে আর মেয়ের পলায়ন, প্রাপ্তি, গৃহে প্রত্যাগমন ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাজোমি বসবে না, যদি না মেয়ের বাবা বসতে অনুরোধ করে।

যদি কনের বাবা মাজোমির কথায় সন্তুষ্ট হয়—তাহলে মাজোমিকে আপ্যায়ন করে এবং তারপর কথাবার্তা ঠিক হয়ে শুভকর্মের অনুষ্ঠান।

পাত্রীর পিতা এই বিবাহে অসম্মত হলে দৌত্যে ব্যর্থ হয়ে মুখ কালো করে ফিরে যায় মাজোমি ছাঙ আর খটক নিয়ে। এরকম অবস্থায় অনেক সময়ে মেয়ের বাবা নিজের কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে।

হাঙরাঙ ছাড়া অন্য অঞ্চলে বাবাই ছেলেকে ঘরে নিয়ে আসে কনেকে শুদ্ধ। তারা বিয়ের অনুষ্ঠান না-করেও স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে পারে। তবে ইলোপমেনটের ঘটনার সাত-আট বছর পরেও বিয়ে হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। যেখানে এই ধরনের বিয়েতে কনেপক্ষ সম্মতি দেয়—সেখানে কনে শুধু বিয়ের কদিন আগেই বাড়িতে ফিরে আসে, নয়ত বাকি দিন থাকে স্বামীর ঘরে।

তৃতীয় পদ্ধতির দারোশ-বিয়ে হল জোর করে ধরে নিয়ে বিবাহ। এই বিবাহ ঘটে কনেপক্ষের সম্মতি বা অসম্মতিতে। অসম্মতির কথাই বলা যাক।

যখন ছেলে আর মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা জন্মে—একজন আর-একজনকে ছাড়া পৃথিবী অন্ধকার দেখে, তখন কনের অভিভাবক বিবাহে সম্মতি না দিলে প্রণয়ী-পুরুষ সুযোগ খুঁজতে থাকে কখন তার দয়িতাকে নিয়ে পালানো যায়। উদ্যমী ও ধৈর্যশীল পুরুষের সুযোগ আসেই। মেয়েটি হয়তো জল আনতে গেছে ঝরনাতলায়, অথবা কাজ করতে খেতে, কিংবা গ্রামের বাইরে কোনো মেলায়, বা উৎসবে—তখনই প্রেমিক-পুরুষ তার বন্ধুদের সাহায্যে মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে যায় তার বাড়িতে, অথবা অসুবিধা থাকলে অন্য কোথাও।

মজার ব্যাপার হল—অপহরণের সময়ে মেয়েটি

কিন্তু এই ধরনের "দস্যুতা"য় বাধা দেয়। এবং যদি কোনোক্রমে এই "আক্রমণ" থেকে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে যেতে পারে—সেটা হবে তার গর্বের বিষয়, সখীদের কাছে বলবার মতো।

আরও উল্লেখযোগ্য—জোর করে মেয়েটিকে নিয়ে যাবার সময়ে কিন্তু আসল প্রেমিকই মেয়েটিকে ধরবে—অন্য কেউ নয়। এই স্পর্শের দ্বারাই মেয়েটির উপরে তার অধিকার-প্রতিষ্ঠা। পাত্রী নিয়ে যাবার পরে পাত্রের পিতা পূর্ববর্ণিত একজন মাজোমি (ঘটক, মধ্যস্থ) পাঠাবে মেয়েটির মা-বাবার কাছে পুত্রের গর্হিত কর্মের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

মধুরভাষী, অভিজ্ঞ মাজোমি পাত্রীর বাড়িতে এসে হাতজোড় করে বলবে—'আপনার মেয়ে তো মোতিমালার সবচেয়ে দামি মুক্তো। আমরাই আপনাদের কাছে যথাবিহিতভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতাম। কিন্তু বাচ্চা ছেলেমেয়ে অবুঝভাবে আগে-ভাগেই একটা কাজ যখন করেই ফেলেছে—তখন ওদের ক্ষমা করে দিন।'

কিন্তু শুধু মিষ্টি কথায় পাত্রীর পিতার মন ভিজবে না। ছেলের বাবার আর্থিক অবস্থানুযায়ী পাত্রীর পিতাকে জরিমানা দিতে হবে। এই "ইজ্জতমূল্য" সাধারণত একশ থেকে পাঁচশ টাকার মধ্যে নির্ধারিত হয়। পাত্রপক্ষকে এই টাকা সঙ্গে-সঙ্গে জমা দিতে হবে। এ-ছাড়া কনের পিতা যে "যানেটাঙ"-প্রথাসিদ্ধ রীতিতে বিবাহের দাবি করেন সে পদ্ধতি ব্যয়বহুল। এই প্রথায় বিবাহের ব্যয়ভার সাধ্যাতীত হলে ছেলের বাবা এ থেকে অব্যাহতির জন্যে অনুরোধ করেন।

যা-ই হোক, এক মাসের মধ্যে একটি শুভদিনে আবরণ ও আভরণে অলঙ্কৃত করে উপহারসামগ্রীসহ মেয়েটিকে পিতৃগৃহে পাঠানো হয়, সঙ্গে যায় তার স্বামী, মাজোমি এবং দুজন স্ত্রীলোক। পাত্র তিন-চার ঝুড়ি "পোলে" (কিন্নরী স্যাকা রুটি) নিয়ে যায় পাত্রীর বাপের বাড়িতে। তা ছাড়া সেখানে সম্মান-প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ পাত্রটি একটি ভক্ষ্য-পাইনের মালা এবং কিছু অর্থ শ্বাশুড়িকে এবং অন্যান্য মহিলা গুরুজনদের অর্পণ করে। এরপরে স্ত্রীকে সেখানে কিছুদিনের জন্যে রেখে নিজের লোকজন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। একটি শুভদিনে পাত্রীর বাবা এবং ভাইয়েরা এসে মেয়েকে তার স্বামীর ঘরে পৌঁছে দেয়।

স্বামীর ঘরে যাবার সময়ে মেয়েকে তার বাবা কিছু বাসনপত্র, গহনা এবং একশ থেকে তিনশ টাকা দেয়। জোর করে ধরে নিয়ে বিয়ে করায় যে-দোষ হয়েছিল—সমবেত আত্মীয়স্বজন তখন পাত্রীকে তা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে।

পাত্রের বাড়িতে নববধূকে পৌঁছে দিয়ে সেখানে পানভোজন করে ফিরে আসে পাত্রীর বাড়ির লোকেরা।

চার

দারোশ-প্রথার সঙ্গে অনেক কৌতুককর কাহিনীও জড়িত।

একবার একটি ছেলের সঙ্গে তাদের সম্প্রদায়ের একটি মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাত্রটি সেই প্রথাসম্মত "যানেটাঙ"-বিবাহের জন্যে অপেক্ষা না-করে "দারোশ"-র আশ্রয় নিয়েছিল।

কেন?

কারণ তার পাত্রী সেই রূপসী কিন্নরী যে গাঁয়ের আরও অনেক তরুণের মনে দোলা দিয়েছিল। এবং পাত্রটি শুনেছিল যে—তাদের প্রথাসম্মত শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হবার আগেই তিন-চারটি যুবক দারোশ-প্রয়োগের কথা ভাবছে। তাই নির্ধারিত পাত্রটি আর "যানেটাঙ"-এর জন্যে অপেক্ষা না-করে নিজেই প্রথম সুযোগে দারোশের মাধ্যমে পাত্রীকে ঘরে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু কোনো মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে এলে ছেলের বাবাকে মাজোমি পাঠাতেই হবে কনের

বাড়িতে ছেলের অপকর্মের জন্যে ক্ষমা-ভিক্ষা করে। তারপরে "ইজ্জতমূল্য" ইত্যাদি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান যার কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থপদ্ধতির বিবাহ "হর"। যখন কোনো বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষের আকর্ষণে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়—তখনই হল "হর" বিবাহ।

কিন্নর সমাজে এ নিয়ে তেমন হইচই হয় না। এরা যেমন শান্তিপ্রিয় তেমনি মুক্তপ্রেমে বিশ্বাসী (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষের সুবিধা অনুযায়ী)। এই ধরনের বিবাহে যে-পুরুষটি নতুন করে স্বামী হতে যাচ্ছে তাকে খেসারত দিতে হয় স্ত্রীর ভূতপূর্ব স্বামীকে—যা নির্ধারিত হয় অর্থমূল্যে। আগের বিয়েতে সেই স্বামী যেসব জিনিস দিয়েছিল তা সব তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। এবং দিতে হয় ইজ্জতমূল্য (খেসারত)। বিবাহে দেওয়া জিনিসপত্র ফিরিয়ে নেওয়া এবং ইজ্জতমূল্য গ্রহণের মধ্যেই এতদিনকার গৃহিণী মুক্ত, ছিন্ন পূর্বেকার বিবাহবন্ধন। বর্তমান প্রেমিকের সঙ্গে বাস করলেই শুরু হয় তাদের নতুন দাম্পত্যজীবন। দরকার হয় না অন্য কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের।

এবারে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে খুব বেশি নয়। বিচ্ছেদের পদ্ধতি অতি সহজ সরল।

যখন কোনো পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তখন একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রামবৃদ্ধরা, স্বামী ও স্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা সমবেত হয়। বিবাহে পাত্রপক্ষের যে-টাকা খরচ হয়েছিল—স্ত্রীর মা-বাবা সেই টাকা পাত্রকে দিয়ে দেয়। যদি ইতি-মধ্যেই মেয়েটির কোনো প্রেমিক (ভবিষ্যৎ স্বামী) জুটে গিয়ে থাকে—এই খরচ সে-ই বহন করে। বিবাহের সময়ে নববধূকে যেসব অলঙ্কার, বাসনপত্র আর অন্যান্য উপহার দেওয়া হয়েছিল—সেসব সে ফেরত পায়। এইসব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবার পরে একটি "রাজিনামা"—বিবাহবিচ্ছেদের দলিল তৈরি হয়। এবং সবশেষে "শিং-টাকশিমিগ"-অনুষ্ঠান: একটি শুকনো কাঠের ছড়ি দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষকে ভেঙে ফেলবার জন্যে। এই কাঠিটি ভাঙবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের বিবাহভঙ্গ-অনুষ্ঠানও সম্পূর্ণ। এরপরে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার নিজের নিজের জীবন-সঙ্গী ও সঙ্গিনী খুঁজে নতুনভাবে বাস করবার।

কিন্নর সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত। নিজের পছন্দমতো বিধবা মেয়েটি আবার বিয়ে করতে পারে। অথবা মৃত স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গেও থাকতে পারে নিজের খুশিমতো। মৃত স্বামীর গৃহে স্বাধীনভাবে কাটাবার অধিকার আছে তার।

কিন্নর সমাজে কোনো পণপ্রথা নেই—দেবার বা নেবার। কোনো পক্ষ থেকেই কোনো দাবি নেই। খুবই সাধারণ জিনিসপত্র—কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, অর্থ ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয় কনেকে।

পাঁচ

কিন্নর-লোকে বহুভর্তৃক-প্রথা সম্বন্ধে আলোচনার আগে 'কিন্নর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্ধৃতি কিন্নরের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপরেও আলোকপাত করবে—

"Polyandry prevails in most of the Kinnar areas but is rapidly losing ground to monogamy. The usual practice is for several brothers to share one wife.

"Sometimes, if a joint wife is barren, her sister is brought in as a second wife. Sometimes, a younger brother in a polyandrous marriage prefers to bring another wife for himself because of the common wife being older. A love affair ending up in marriage may also result in seperation of one of the husbands in a polyandrous family. In this case the joint property must be partitioned, unless the new wife consents to be shared by

all the brothers. If she refuses, she and her husband must go away and live in a separate house. The latter does not, however, lose his share in the original joint wife, although as a matter of practice, she usually refuses to have anything to do with him. This system has stood the test of time in Kinnar and has contributed to keep the families and their holdings intact.

"Polyandry is still vehemently defended by the older generation who practise it on the ground of its usefulness in keeping the family closely knit and preventing both overpopulation and sub division or fragmentation of the already small agricultural holdings. It enables a family where joint labour is required to eke out a precarious living from the inhospitable land, to get full benefit from several resources for their livelihood by way of pooling them together. Polyandry, was, in former days, directly encouraged by the state through penalties exacted on partition. When a set of brothers divided moveable property one-half share of the whole was appropriated by the state, and division of immovable property were refused official recognition."

[Gazetter of India : Himachal Pradesh : Kinnar by M. D. Mamagain, State Editor, District Gazetteer, Him, Pradesh (1971 ed)]

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে হিমাচল প্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কিন্নর জেলা গেজেটিয়ারের এই উদ্ধৃতি থেকেই প্রতীয়মান—বহুভর্তৃকপ্রথা একদা কিন্নরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে এই প্রথা বিলীয়মান। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা এখনও এই প্রথাকে ধরে রাখতে চাইছেন এবং এই প্রথার সপক্ষে তাঁরা যে-সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি দেখান তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। বস্তুত, কিন্নরের বহু স্থানে বহুপতিপ্রথা বর্তমান। শুধু কিন্নরেই নয়, হিমাচলের লাহুল-স্পিতি জেলায় এবং সিরমোর জেলায় স্থান-বিশেষে এই প্রথা বিদ্যমান।

দূর সমতলবাসীর চোখে সহসা বহুভর্তৃকপ্রথা বিসদৃশ ও অশোভন মনে হতে পারে, কিন্তু আবহমান কাল ধরে পুরুষানুক্রমে যারা চোখের সামনে এই প্রথা অনুষ্ঠিত হতে দেখে আসছে তাদের কাছে এটা তো অতি স্বাভাবিক আর সাধারণ বলেই মনে হবে।

কিন্নরে কৃষিযোগ্য জমির অভাব। পলিয়্যানড্রি নিঃসন্দেহে জনসংখ্যা সীমিত রাখতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বহুভর্তৃক নারীর সন্তানসংখ্যা কম। সেই জন্যেও এদের ফসলের খেত বহুভাগে বিভক্ত হয়ে কৃষি-অর্থনীতিকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে না।

কিন্তু শিক্ষার প্রসারের ফলে যারা সরকারি কাজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছে, সমতলের জীবনযাত্রার পরিচয় পাচ্ছে—এই প্রথা তাদের কাছে লজ্জাজনক বলে মনে হয়। তারা চাইছে আলাদা স্ত্রী নিয়ে একক পৃথক জীবন-যাপন করতে। পুরাতনপন্থী পিতার সঙ্গে এই নিয়ে দেখা দেয় সংঘাত—যেমন আধুনিক জীবনে দেখা দেয় যখন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান প্রেমে পড়ে অসবর্ণ বিবাহ করতে যায়।

হিমাচল প্রদেশের ভূতপূর্ব এবং প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ড. যশবন্ত সিং পারমার "দ্য সোস্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিমালয়ান পলিয়্যানড্রি" গবেষণা-রচনাটি লিখে ডক্টরেট পান। ড. পারমার নিজে ছিলেন সিরমোর জেলার অধিবাসী। হিমাচল প্রদেশে বহুভর্তৃকপ্রথা সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর "পলিয়্যানড্রি ইন দ্য হিমালয়াজ" গ্রন্থে। তিনি একজন স্ত্রীর সঙ্গে বহুপতির যৌন-জীবন সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা করেছেন। বিবাহের আগে ভাবী বধূ ভালো করে জেনে নেয়—তার ভবিষ্যৎ স্বামীর ভাইদের সংখ্যা এবং তারা কে কেমন বিবাহের পরে

যারা তার উপরে স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করবে। যদি ভাইদের কারো একজনকে তার ভালো না-লাগে, বা একজন কারোর সম্বন্ধে তার আপত্তি থাকে—তা হলে ঐই পরিবারে বিবাহেই সে সম্মতি দেবে না।

বিবাহের পরে স্ত্রী এ-বিষয়ে সচেতন থাকে যাতে তার সব স্বামীই সমান মনোযোগ পায়। একজন স্বামীর উপরে বিশেষ পছন্দ দেখাবার ফলে ভাইদের মধ্যে যাতে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব শুরু না হয়—সেদিকে সে দৃষ্টি রাখে। বিশেষ এক ভাইয়ের প্রতি পক্ষপাত দেখালে কিন্নর-সমাজও তা সমর্থন করে না।

রাতে ভাইয়েরা যখন আপন আপন শয্যায় শুয়ে থাকে তখন যার সঙ্গে সে রাত কাটানো পছন্দ করে তার পাশে গিয়েই শয্যা গ্রহণ করে। এইভাবে সব স্বামীর প্রতিই সে তার স্ত্রীর কর্তব্য পালন করে এবং সব স্বামীই, সাধারণত, স্ত্রীর ভাগ পায়।

যে-স্বামী বয়সে ছোট সে-ও জানে ভাইদের স্ত্রীর উপরে তারও অধিকার আছে। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে যদি সেই অধিকার দাবি করতে না-আসে—অন্যরা তাকে সে-বিষয়ে সচেতন করে। এ-ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেয় স্ত্রী। ছোট ভাই যেমন বড় হতে থাকে স্ত্রী তাকে যুগ্ম-জীবনের ব্যাপারে সক্রিয় করে তুলতে থাকে। মনে যৌন-কামনা জেগে অন্য মেয়ের কাছে যাবার প্রয়োজন তার স্ত্রী-ই মেটায়।

বিবাহের ফলে যেসব ছেলেমেয়ে জন্মে পরিবারের বড় ভাইকে তারা ডাকে 'তেগ বোবা' (বড় বাবা) আর কনিষ্ঠ ভাইদের 'গাতো বোবা' (ছোট বাবা)। তবে বড় ভাইই প্রকৃতপক্ষে পিতার সম্মান পায়। যদি কোনো কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে যায় তখন স্ত্রীই বিভিন্ন সন্তানদের পিতৃত্ব নির্দেশ করে দেয়।

বহুভর্তৃক সমাজে বহু মেয়েকে সারাজীবন অবিবাহিতা থাকতে হয়। খুব কষ্টের জীবন তাদের। অবশ্য অনেক অবিবাহিতা মেয়ে মনাস্টারিতে (বৌদ্ধ-মন্দির, গোম্ফা) গিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর জীবন কাটাতে পারে। পরিবারের কোনো সম্পত্তিতে তাদের অধিকার থাকে না। লাহুল-স্পিতির বহুপতি সমাজেও একই অবস্থা।

বহুপতি-পরিবারে স্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত কঠিন। সে পরিবারের কেন্দ্র-চরিত্র। খুব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ভূমিকা পালন করতে হয় তাকে। পরিবারের ঐক্য তার পরিচালনার উপরে নির্ভরশীল। কোনো স্বামীর মনে যাতে রোষ, ক্ষোভ বা ঈর্ষা না জাগে সেদিকে তাকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। নয়তো কোনো কারণে কোনো ভাই ক্ষুব্ধ হয়ে আলাদা হয়ে গেলেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়বে।

শুধু ঘর-সংসারেই নয়, খেতে কৃষিকাজেও কিন্নরী নারী সর্বতোভাবে সাহায্য করে। তারা বীজ বোনে, আগাছা উপড়ে দেয়, জল-সেচন করে, ফসল ঘরে তোলে, খড় সংগ্রহ করে, জ্বালানি জোগাড় করে, গৃহপালিত পশু চরায়, বোঝা বয়, এবং করে আরও হাজারো কাজ।

যদিও সর্বতোভাবে কঠিন পরিশ্রম ক'রে সব কাজ সে করে যায়—তা হলেও আশ্রয়, আহার ও আবরণের জন্যে সে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। একমাত্র বিবাহের সময়ে পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে যে-উপহার সে পায়—তা ছাড়া অন্য কিছুতে তার কোনো অধিকার নেই, পিতা বা স্বামীর কোনো বাড়ি-ঘর বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এমনকী, দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা দৈহিক পরিশ্রম করে যে দৈনিক পারিশ্রমিক পায় তাও বিবাহিতা হলে স্বামীকে, অবিবাহিতা হলে বাবাকে দিতে হয়, নিজের জন্যে সে খরচ করতে পারে না।

ড. পারমার তাঁর পূর্ব-উল্লিখিত 'পলিয়্যানড্রি ইন দ্য হিমালয়াজ' (এই বইটির কয়েকটি মন্তব্য নিয়ে হিমাচল প্রদেশ বিধানসভায় একবার তুমুল বিতর্ক হয়েছিল) গ্রন্থে লিখেছেন যে—পাহাড়ি সমাজে মেয়েদের জীবন একান্তভাবেই পুরুষের অধীন, যেন

বাজারের কোন জিনিস—যে সবচেয়ে বেশি দাম দেবে তার কাছে বেচে দেওয়া যায়, এমনকী স্বামী মারা গেলে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের অধিকারগত বস্তু সে। যখন স্বামীর ঘর করে—যে কোনো সময়ে সে তাকে ত্যাগ করতে পারে অত্যন্ত তুচ্ছ অজুহাতে।

কিন্নরী মেয়েদের জীবনে পুঞ্জীভূত মধ্যযুগের অন্ধকার। একটি কিন্নরী লোকসঙ্গীতে আছে—

জোমো লামা তাংগুমা, শুম্ কৌশাংগ সুখো,
দোম্যাক সুখী
মনরিংগন চোঁই কু মুরে, বৌনযুগস চোঁই কু বাগে।
পরেয়ো বিমাতাংগমা, শুম্ বোশাংগ সুখী,
দোম্যাক দুখী

ঘোন্ বোন্ ধংঘে লামীক, সারে জংজালু কোমো।
প্রাঞ্জল অনুবাদে গানটির মর্মার্থ—
যদি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী হও কাটবে প্রথম তিন বছর
বহু যন্ত্রণায়,
তারপরের জীবন শান্তির, নারী-পুরুষ সবাই
জানাবে প্রণাম—
বিয়ে করে সংসারী হও, সুখেই কাটবে প্রথম
তিন বছর,
পরের জীবনে দুঃখ অশেষ, ঘর-সংসার জনজাল—
শুধু জনজাল।

কিন্নরী নারীর মর্মন্তুদ বেদনা অতি সার্থকভাবে স্পন্দিত হয়েছে এই লোকসঙ্গীতের মধ্যে।

একটি বিজ্ঞপ্তি

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যায় থাকছে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক সুনীল সেনগুপ্ত লিখিত বিশেষ সন্দর্ভ : "বাঙলা সংস্কৃতের বন্ধন প্রসঙ্গে" যার প্রস্তাবনা অংশেই লেখক নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন : 'একটা কথা এখানে আগে-ভাগেই বলে নেওয়া ভালো—ভারতীয় ভাষাসমূহ এমনকী দক্ষিণী ভাষাসমূহ নাকি সংস্কৃত থেকে জন্মেছে, এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক অথচ লৌকিক বিশ্বাস বিশেষ পরিব্যাপ্ত, যা বহু অন্যবিষয়ের পণ্ডিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত—তা আমরা প্রথমেই খারিজ করছি। কারণ তা আলোচনার মানকে অতি নীচে নামিয়ে আনবে।'

গ্রন্থসমালোচনা

বিশ্বাস এবং যুক্তি

সনাতন মিত্র

যা যুক্তিতর্কের বাইরে, তার দিকে মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ আছে ; জগৎসংসারে যে নিয়মেরই রাজত্ব, তাও অস্বীকার করার সাধ্য মানুষের নেই। কাজের ব্যাপারে যুক্তিকেই অবলম্বন করতে হয়, সে জ্ঞান আমাদের সকলেরই বেশ টনটনে। এমনকী, মানুষকে বোঝাবার জন্যে, যা যুক্তির অতীত তাকেও কোনো রকমের একটা যুক্তির ওপরে স্থাপিত করতে হয়। ওমুক জজসাহেব, ওমুক বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ওমুক খবরের কাগজের রিপোর্টার যে কবচ কিংবা মাদুলির গুণগান এত উচ্চকণ্ঠে করেছেন, সে কবচ, সে মাদুলি মিথ্যা ? ওঁরা কি সব আহাম্মক, আর তুমিই একমাত্র সেয়ানা ? একে যুক্তি বলা যায় না, যুক্তির ছায়ামাত্র। কিন্তু যে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চায়, তার পক্ষে এই যথেষ্ট। আবার কখনও-কখনও এটুকুরও দরকার হয় না।

নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেই চেয়েছিলেন। সেই-জন্যে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করতে রামকৃষ্ণকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। অবশ্য রামকৃষ্ণও কোনো একটা শক্তির অধিকারী ছিলেন। সে শক্তি আধ্যাত্মিক না মনস্তাত্ত্বিক, সে বিচারে প্রবৃত্ত হতে চাই না। অমল-কুমার রায় ধরে নিয়েছেন—রামকৃষ্ণ সম্মোহনীবিদ্যা জানতেন, 'লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতাও রামকৃষ্ণের ছিল।' এইটুকু বলেই তিনি থামেন নি, তারপরেই বলছেন, 'প্রয়োজনবোধে তিনি mesmerize বা সম্মোহিত করিতেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে তিনি সম্মোহিত করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ নিজেও জানতেন—তাঁর মধ্যে এরকম কিছু একটা শক্তি আছে। লেখক উল্লেখ করেছেন, তিনি ভক্তদের কাছে বলেছেন, 'কথা কইতে-কইতে অমন কোরে ছুঁয়ে দি কেন জানিস ? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে সেইটে কোমে গিয়ে ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।'

ব্যক্তিত্বের এইরকম প্রভাব যখন এমন একজনের ওপর এসে পড়ে যে ভিতরে-ভিতরে কোনো সংশয়াতীত বিশ্বাসের জন্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তখন যুক্তিতর্ক যে ছত্রভঙ্গ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী ? যুক্তিতর্কই যদি বিসর্জন দিতে না পারলাম, তাহলে আমার কীসের ভক্তি, কীসের প্রেম ?

অমলকুমার রায় রামকৃষ্ণের ভাবাবেগ 'বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে' ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ স্নায়বিক কেন্দ্রের অস্বাভাবিক বা বিকৃত গঠনের ফল। অস্বাভাবিক যে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, আর বিকৃত গঠনের কথাও মেনে নিতে আপত্তি কী ? যা সচরাচর দেখা যায়, আর-পাঁচজনের যা থাকে, তা থেকে অন্যরকম কিছু না থাকলে, মানুষটি এমন সৃষ্টিছাড়া হবেন কী করে ? ভক্তজন যদি বলেন, ঈশ্বর অন্যরকম করেই তাঁর স্নায়ু গড়েছিলেন, তার কী উত্তর ? আসলে সেটা কোনো কথা নয়। আসলে, কী করে কী হল তার

বিদ্যাসাগর ও পরমহংস—অমলকুমার রায়। নবার্ক। পঁচিশ টাকা।

অশান্ত কাল জিজ্ঞাসু যুবক—সুরেশচন্দ্র মৈত্র। পুঁথিপত্র। পঁয়ত্রিশ টাকা।

অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবাদ ও ধর্মবিচার—সাধনা মজুমদার। রেনেসাঁস পাবলিশার্স। মূল্য অনুল্লেখিত।

কাজী আবদুল ওদুদ—খোন্দকার সিরাজুল হক। বাঙলা একাডেমি, ঢাকা। পনেরো টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিজিতকুমার দত্ত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ছ টাকা।

ব্যাখ্যা দিয়ে বিজ্ঞান কোনোদিন, বিশ্বাসই বলুন আর কুসংস্কারই বলুন, তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। বায়ুমণ্ডলে লঘুচাপের সৃষ্টি হয়, জলকণাবাহী বাতাস সেখানে ধেয়ে আসতে থাকে, তাই ঝড়বৃষ্টি হয়। বেশ কথা। যদি বিশ্বাস করি—ঈশ্বর ঝড়বৃষ্টি করান, আবহবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে বলতে পারি, তিনি, অর্থাৎ ঈশ্বর তো ওইভাবেই ঝড়বৃষ্টি করাবেন। চল্লিশ দিনের যে বৃষ্টির পর নোয়া তাঁর নৌকো ভাসিয়েছিলেন, তাও প্রভু ওইভাবেই করিয়েছিলেন।

বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে নড়ানো যাবে কিনা তা নির্ভর করে যে বিশ্বাস করে সে কী চায়, না-চায়—তার ওপর। এবং সে কী চাইবে, না-চাইবে, তা নির্ভর করে তার চরিত্র, তার প্রয়োজন, তার পারিপার্শ্বিক, এরকম আরও অনেক কিছুর ওপর। "বিদ্যাসাগর ও পরমহংস" বইয়ের লেখক বস্তুবাদী নন। তিনি অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না, কেন না 'ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে একজন মনুষ্যমাত্রকে স্থাপন করা হয়, ছায়া দিয়া কায়াকে ঢাকা হয়, নিজের বিচারবুদ্ধির অবমাননা করা হয়, ঐশী শক্তির অবমাননা করা হয়।' অর্থাৎ, যতটা ভেবে দেখলে এবং যেভাবে ভেবে দেখলে অবতারবাদ খারিজ হয়, তিনি ততটা এবং সেইভাবে ভেবে দেখতে রাজি, কিন্তু 'ঐশী শক্তি' সম্পর্কে বিচারের জন্যেও যে তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, এই বইয়ে অন্তত তার কোনো পরিচয় নেই। এই ব্যর্থতার (একে যদি ব্যর্থতা বলি) কারণ কী—তারও মনস্তাত্ত্বিক, কিংবা অন্যবিধ ব্যাখ্যা হয়তো থাকতে পারে। আপাতত এইটুকু বুঝলেই যথেষ্ট, অবতারবাদে বিশ্বাসে যাঁর প্রয়োজন নেই, ঐশী শক্তিতে বিশ্বাসে তাঁর প্রয়োজন থাকতে পারে।

রামকৃষ্ণদেবের ভাষা গ্রাম্য, অমার্জিত, এমনকী অশ্লীল ছিল, কথাবার্তা এবং আচার-আচরণে স্ববিরোধ ছিল, তত্ত্ববিচারে—তা সে বৈজ্ঞানিকই হোক আর শাস্ত্রীয়ই হোক—অভাব ছিল আগ্রহের এবং ক্ষমতারও। আসলে, এইসব নিয়েই তিনি একটি মানুষ ছিলেন (মানুষের অতিরিক্ত কিছু ছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন এই আলোচনার পরিধির বাইরে) যাঁর দ্বারা অন্য অসংখ্য মানুষের কোনো-না-কোনো প্রয়োজন আজও মিটছে।

লেখক মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখেছেন, রামকৃষ্ণের মত ও পথ প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষিদের সঙ্গে মেলে না। তিনি বলেন এক কথা, আর আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে দেখি অন্য কথা। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এমন দেখা যায়। বড়ো-বড়ো শিক্ষক এবং সমালোচকরা যেসব মতামত ব্যক্ত করে গেছেন, আইনকানুন বেঁধে দিয়েছেন, অক্ষরে-অক্ষরে সেসব প্রতিপালন করে কত বই লেখা হল, কত মূর্তি গড়া হল, ছবি আঁকা হল—কে তার হিসেব রাখে? তারপর হঠাৎ এমন কিছু একটা বেরিয়ে এল যার স্বকীয়তাতেই যার শক্তি, যার অস্তিত্বই যার আইন। For the Son of man is Lord even of the sabbath day (Matthew 12: 8) শাস্ত্রের সঙ্গে যদি তাঁকে মেলানো যায়, তাহলে শাস্ত্রই আবার নতুন করে লিখতে হয়। যাদের তাঁকে প্রয়োজন, তাদের, শাস্ত্রকে নয়, তাঁকেই প্রয়োজন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তাঁকে প্রয়োজন ছিল না। অমলকুমার রায় ঠিকই বলেছেন, 'বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে ধর্মক্রিয়ার স্থান ছিল না।' তাঁর এবং রামকৃষ্ণের অবস্থান দুই মেরুতে। রামকৃষ্ণের কি তাঁকে প্রয়োজন ছিল? 'কোনও গুণী পুরুষের কথা শুনিলেই রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তিনি এইভাবে গিয়া দেখা করেন।' অবশ্যই, কিন্তু কেন? প্রচারের প্রয়োজনে? লেখকের তাই মত। সোজাসুজি না বললেও অন্তত ইঙ্গিত, মনে হয় সেইদিকেই করেছেন। কিন্তু এমন লোকেদের সম্পর্কে সত্যিকারের একটা আগ্রহ তাঁর মনে ছিল, তাও অসম্ভব নয়। কিংবা হয়তো ভেবেছিলেন, 'চিনি খেতে ভালবাসি', এঁরাই বা কেন সে চিনি খেতে পাবেন না, এত গুণ থাকা সত্ত্বেও।

বিদ্যাসাগর অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অমলকুমার রায় তাঁর 'অন্তরের বিশালত্ব, তাঁর পরার্থপরতা, সক্রিয় সহৃদয়তা' অতি সুন্দরভাবে, একের পর এক তথ্য সন্নিবেশিত করে, ভাবালুতা সম্পূর্ণ বর্জন করে এই বইয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে বিদ্যাসাগর ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে তারানাথ বাচস্পতির কাছে যান চাকরির প্রস্তাব নিয়ে, রাস্তায় রোজগারের আশায় যে গণিকা দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে চলে যান, অক্ষম বৃদ্ধের মোট দু-তিন ক্রোশ বয়ে দেন, উন্মাদিনী কুষ্ঠীবালা তাঁর হাতে না হলে খাবেন না শুনে রোজ শত কাজের মধ্যে তাঁকে নিজহাতে খাওয়াতে যান, তাঁকে আমরা চিনি না তা নয়, অমলকুমার রায় আরও ভালো করে, আরও স্পষ্ট করে তাঁকে চিনিয়ে দিলেন।

বিদ্যাসাগর আর রামকৃষ্ণ—এই দুই জীবনাদর্শ পাশাপাশি রেখে লেখক প্রশ্ন করেছেন, এদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, কোন্‌টি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত? বিদ্যাসাগর পরহিতব্রতী কর্মযোগী ছিলেন, রামকৃষ্ণ নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, নিজের স্বভাব এবং চরিত্র অনুযায়ী, নিজের জ্ঞান এবং চেতনা অনুযায়ী একটা অভীষ্টের দিকেই মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন।

মানুষকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ডিরোজিওরও ছিল। (সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর "অশান্ত কাল জিজ্ঞাসু যুবক"-এ লিখেছেন, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, কিন্তু আমরা নামের বহুপ্রচলিত রূপটিই ব্যবহার করার পক্ষপাতী।) অশান্ত কাল তো বটেই, জিজ্ঞাসু যুবকটি তাকে আরও অশান্ত করে তুললেন। তিনি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন নি, ভাইবোনে বিয়েতে আপত্তির কিছু নেই এমন উদ্ভট শিক্ষা কাউকে দেন নি, এমনকী বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা নৈতিক কর্তব্য নয়, এমন কথাও কোনো ছাত্রকে বলেন নি। তা হলে অশান্তি ঘটল কী নিয়ে? যে যে নির্দিষ্ট অভিযোগ তাঁর নামে আনা হয়েছিল, দেখা গেল তার কোনোটিই সত্য নয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হল। তার যথেষ্ট কারণ ছিল। কলেজের পরিচালক একটি বিষয়ে তাঁদের মতামত স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, নৈতিক প্রশ্নে হিন্দু সদস্যদের ভোটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

নীতি নিয়ে, বিশেষ করে ধর্মনীতি নিয়ে, প্রশ্ন তুললেই একটা নৈতিক প্রশ্ন এসে পড়ে। সেটা হল, ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা কি উচিত? ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদের সহযোগে দিনের পর দিন ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে লাগলেন, এবং সেসব প্রশ্নের খোলাখুলি আলোচনা, তাঁর উৎসাহে, চলতে লাগল তাঁর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে। "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"-এ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে স্বাধীন ও অসংকুচিতভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিও-শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতিনীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন।' তার ফল কী হল, সে বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দু কলেজের কেরানি জয়মোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত বিবরণ থেকে উদ্‌দৃতি দিয়েছেন:

The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects.... The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings.

যে আলোড়ন এর ফলে সমাজে উঠল, শিবনাথ শাস্ত্রী তার বিবরণ দিয়েছেন। সে বিবরণ পড়লে বুঝতে বাকি থাকে না—ডিরোজিওর পক্ষে হিন্দু

কলেজের শিক্ষকের পদ বজায় রাখা কেন অসম্ভব হয়ে উঠল। রাধাকান্ত দেব ছিলেন হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অভিভাবক। আরও অনেকে ছিলেন হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয়। তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল এই সর্বনাশের হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক মূলকে উৎপাটন করার জন্যে বদ্ধপরিকর হওয়া।

এই ইতিহাস লেখক বিবিধ প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহযোগে বিবৃত করেছেন। ডিরোজিও কেমন মানুষটি ছিলেন, তাঁর বাইশ বছরের জীবনে কী প্রবল ধাক্কা দিয়ে গেছেন আমাদের সমাজে, তার পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যায়। সেজন্যে পাঠকের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কারণ আছে। শুধু মাঝে-মাঝে মনে হয়ে ডিরোজিওর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে নিজের প্রতিকূলতা অতটা শানিত না করলেও পারতেন। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। আর ছাপার বিষয়ে তিনি আরেকটু মনোযোগ দিলে পাঠক অনেক বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচতেন। ছাপার ভুল, বিশেষত ইংরেজি অংশগুলোতে এত বেশি, এবং এমন মারাত্মক যে কোথাও-কোথাও অর্থ উদ্ধার করাই কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পর্কে সাধনা মজুমদার তাঁর পুস্তিকাটিতে ঠিকই বলেছেন—তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং ডিরোজিওর তুলনায় উপেক্ষিতই বটে। তার কারণ বোঝা কিছু কঠিন নয়। শুধুমাত্র কলমকেই যিনি অবলম্বন করেন, এবং সে কলম দিয়েও গল্প উপন্যাস ইত্যাদি লেখেন না, তাঁর পক্ষে এর বেশি আশা করাই বোধহয় বাতুলতা। অক্ষয়কুমারের শীতল, অনুত্তেজিত যুক্তিপরায়ণতা আরোই তাঁকে জনপ্রিয়তা থেকে দূরে রেখেছে। শিক্ষাবিষয়ক এবং সমাজবিষয়ক চিন্তায় তিনি কতদূর এগিয়ে ছিলেন, লেখিকা তার বিবরণ দিয়েছেন। তার চেয়েও আশ্চর্যজনক ধর্মবিষয়ক চিন্তায় তাঁর মুক্ত বিচারবুদ্ধির অকুণ্ঠ প্রয়োগ। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" একটি বিস্ময়কর কীর্তি।

বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী (অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীর পরের শ্রেণী) পর্যন্ত যাঁর প্রথাগত শিক্ষা, তিনি যে অপরিমেয় প্রচেষ্টায় নিজেকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তুললেন, লেখিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণেও তা প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ইনি লিখেছেন 'স্বাধ্যয়ন ছিল তাঁর নিত্যব্রত।' তাঁর পাঠের বিষয়ের তালিকাটি দেখলে হতবাক হতে হয়। গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, জার্মান, পদার্থবিদ্যা, উচ্চগণিত, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য। এইখানেই কি শেষ? লেখিকা বলছেন, "তত্ত্ববোধিনীতে উচ্চ মানের রচনা পরিবেশনের তাগিদে তাঁর বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত হল।...তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় পাঠ নিতে থাকেন...এই সময়ে তিনি মে'ডিকেল কলেজের অতিরিক্ত ছাত্র হিসেবে প্রথম বর্ষে রসায়ন ও দ্বিতীয় বর্ষে উদ্ভিদ-বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন। এরই সঙ্গে চলতে থাকে ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন। তাঁর জীবনীকারের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায় হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানের জন্য তিনি অল্প সময়ের মধ্যে উপর্যুপরি ছোটবড় সহস্রাধিক পুস্তক পাঠ করেন।' এর পরেও যোগ করতে হয়, ইত্যাদি।

এমন ছিলেন যে পত্রিকার সম্পাদক, তার মান, তার উৎকর্ষ, তার বিষয়-বৈভব কী রকম হতে পারে সহজেই বোঝা যায়। লেখিকা যথার্থ বলেছেন, 'বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ার বহুপূর্বেই অক্ষয়কুমার উন্নতমানের পত্রিকা সম্পাদনার এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সম্পাদক হিসেবে তাঁর নিরলস শ্রম, নিষ্ঠা, আদর্শবাদ ও স্বার্থত্যাগ সেকালে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল।'

নিরলস এবং নিঃস্বার্থ জ্ঞানানুসন্ধান, অবিচল, অকুতোভয় সত্যনিষ্ঠা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অক্ষয়কুমার দত্ত। লেখিকা শুধু যে বলেছেন তাই নয়। দেখিয়ে দিয়েছেন, 'বুদ্ধি যতদূরে এবং যেখানে নিয়ে যেতে পারে, তিনি নিঃসংশয়ে সেখানে পৌঁছতে প্রস্তুত

ছিলেন।' বুদ্ধির অগম্য স্থান যদি কিছু থেকে থাকে, সে দিকে পা বাড়াতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। '১৮৫৫ সালে মাঘোৎসবের ভাষণে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রায় অলক্ষিত 'অপরিজ্ঞেয়' শব্দটি একাধিকবার প্রয়োগ করেন।' ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর সৃষ্ট 'পরিদৃশ্যমান বিশ্ব' আমাদের অধিকতর মনোযোগের বস্তু হোক, এ ইচ্ছা তিনি বারেবারে এবং অত্যন্ত জোর দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। 'পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্বরূপ সর্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্বচনীয় স্বরূপ ও আমারদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমারদিগের ব্রাহ্ম-ধর্মের মূল।'

"অখিল বিশ্ব" আর মানুষের "কর্তব্যাকর্তব্য"। এর বাইরে যদি কিছু থাকে (নেই তা অক্ষয়কুমার বলছেন না) তা আমাদের জানার নয়। জ্ঞাতব্যের সীমা তো প্রকৃতিই নির্ধারিত করে দিয়েছে। আর কর্তব্য? সে বিষয়েও অক্ষয়কুমারের মত খুব স্পষ্ট। জগতের নিয়মের প্রতিপালন। 'জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর তবে এ বাক্য অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র জানিয়া তদীয় নিয়ম পালনে অবশ্যই অনুরাগ জন্মিবে।'

"তুহ্ফাৎ-উল-মুওহাজিদিন"-এ রামমোহন যে শাস্ত্রনিরপেক্ষ, বিশ্বজনীন ধর্মের কথা বলেছেন, অক্ষয়কুমারের ধর্মমত মূলত তারই অনুসারী, কিন্তু অক্ষয়কুমার আরও বিজ্ঞানমুখী, আরও যুক্তিবাদী। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতটা হজম করা সম্ভব ছিল না।

উনিশ-কুড়ি পৃষ্ঠার মধ্যে যে দক্ষতার সঙ্গে সাধনা মজুমদার অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তাভাবনাকে সংহত করেছেন, যে পরিশ্রমে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন, যে রকম সহজ, স্বচ্ছ অথচ সারবান ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রচলিত অর্থে যাকে ধর্মবিশ্বাস বলে তা বর্জন করেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ ধর্ম-বিশ্বাসী ছিলেন যদিও অক্ষয়কুমার দত্তের "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" তাঁকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে তিনি এর ফলে আমিষ ভোজন ত্যাগ করেন, এবং তাতে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। 'ইসলাম ধর্মে তাঁর গভীর আস্থা ছিল।' 'অথচ মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ তাঁকে বরাবরই ভুল বুঝেছে এবং নজরুলের মতো তাঁকেও 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করেছে।' খোন্দকার সিরাজুল হক তাঁর গ্রন্থের অনতিবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির অধার্মিক বলে নিন্দিত হওয়া অসম্ভব তো নয়ই, বরং বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় স্বাভাবিকই হতে পারে। পরধর্ম-বিদ্বেষ যখন ধার্মিকতার প্রধান লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, তখন ওদুদের মতো, যাঁরা বিদ্বেষভাব পোষণে অক্ষম, যাঁরা ঈশ্বরপরায়ণতার থেকে সাম্য ও মৈত্রীর সাধনাকে আলাদা করে দেখতে অক্ষম, তাঁদের ভাগ্যে নিন্দা ও অপবাদ ছাড়া আর কী জুটবে? এক-এক সময়ে মনে হয় আবদুল ওদুদ ভুল সময়ে জন্মেছিলেন! তাঁর জীবনকালের ইতিহাস এদেশে ধর্মীয় সংঘাতের ইতিহাস, হিন্দুমুসলমানের ক্রমবর্ধমান মানসিক ব্যবধানের ইতিহাস। এই অতিশয় প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে তিনি আজীবন তাঁর মৈত্রী-ভাবনাকে হিংসা-দ্বেষের উপর্যুপরি আক্রমণ থেকে রক্ষা করে গেছেন। ধর্মকে তিনি কী চোখে দেখতেন, "শাশ্বত বঙ্গ" থেকে একটি উদ্বৃদ্ধিই তা স্পষ্ট করে দেয়:

'ধর্মের বিচিত্র বিধিবিধানের মূল যে সূক্ষ্ম মনুষ্যত্ব সাধন অর্থাৎ জ্ঞান ও চরিত্র-লাভ ও অশ্রান্ত শুভ-সাধনা, সেই অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপারটা ভুলে গেলে ধর্মের বিধিবিধান পালনের দ্বারাও কোন সত্যকার

লাভ সম্ভবপর নয়—তা সে বিধিবিধান যত বিচিত্র যত কষ্টসাধ্য হোক।'

এ ধর্ম সেধর্ম নয় যা নিয়ে কোনো উন্মাদনা সৃষ্টি করা যায়। এ ধর্ম বরং অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্মেরই কতকটা কাছাকাছি। কাজেই ওদুদের "বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলন যে বিপুলসংখ্যক মানুষকে আন্দোলিত করতে পারবে না, তাতে আশ্চর্য কী?

তবু এঁদের প্রভাব তলে-তলে একটা থেকেই যায়। প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে, বিপুলসংখ্যকের ওপর না হোক অল্পসংখ্যকের ওপর তার রেশ থাকে, এবং আজ না হোক কাল মানুষের অগ্রগমনে তার সুফল খানিকটা লক্ষ করা যায়।

খোন্দকার সিরাজুল হকের বই মানুষ, চিন্তাবিদ এবং সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদকে চিনতে সাহায্য করে।

বঙ্কিমচন্দ্র মানসিক গঠনে যুক্তিপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি অত বড় ছিলেন বলে, এবং যেহেতু উপন্যাসে অলৌকিকের ব্যবহার তিনি অকর্তব্য বলে মনে করেন নি, আমাদের চিন্তার জগতে তাঁর প্রভাব ঠিক কী ভাবে এবং কতখানি কার্যকর তা নির্ধারণ করা একটু কঠিন। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান অপরিমেয়। এইটুকু বললেই তাঁর সম্বন্ধে সব বলা হয় না। কিন্তু সবটা বলতে গেলে অনেক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। বিজিতকুমার দত্ত সে চেষ্টা করেন নি। তাঁর পুস্তিকার সীমার মধ্যে তা হয়তো সম্ভবও ছিল না। তারই মধ্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন।

ভারতশিল্পের আধুনিকতা ও নন্দলাল

সমীর ঘোষ

একটা সময় ছিল যখন চিত্রকলার প্রভূত চর্চা হলেও চিত্রকলা সম্পর্কিত, বিশেষভাবে সমসময়ের চিত্র-ভাবনা-সমৃদ্ধ বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশের পরিসর ছিল সীমাবদ্ধ। বর্তমানে, বিশেষত বিগত দু দশকে, ভারতীয় শিল্প- এবং শিল্পী-সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশের পরিমাণবৃদ্ধি তাৎপর্যময় এবং আশাব্যঞ্জক। দৃষ্টি-কোণের বহুধা বিস্তারে নানা জন নানাভাবে শিল্পী আর শিল্পকে দেখতে আর দেখাতে চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত কথাকাহিনী, সমাজসম্পর্কিত ভাবনার প্রেক্ষায় শিল্পী ও শিল্পের অবস্থান, কিংবা শিল্পনন্দনের তত্ত্বগত মনস্কতার সঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পী-শিল্পের অবস্থানের তুলনারীতিতে সমগ্রতাকে ধরার চেষ্টাও ক্রমেই লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। এই ভাবনার সূত্র ধরেই প্রকাশ পেয়েছে সত্যজিৎ চৌধুরীর "নন্দলাল" নামের একখানি পরিচ্ছন্ন নয়নলোভন গ্রন্থ। লেখক শিল্পী নন, কিন্তু শিল্পের প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিক অন্বেষার তাগিদ এবং বিষয় উপস্থাপনে নতুন তথ্য সংযোজনের ঐকান্তিক আগ্রহই তাঁকে সম্ভবত এই গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৬৬ পৃষ্ঠার বিস্তারী আবহে গ্রন্থের মূল রচনাকে তিনি চারটি অংশে ভাগ করেছেন। গুরুর পাশে, ভারতীয় আধুনিক-শিল্পী, জাপানের প্রেরণা এবং নন্দনভাবনা, ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে তুলেছেন নন্দলালের আবির্ভাব থেকে পরিণতি এবং সৃজনী ও নন্দনভাবনার পর্যায়ক্রমিক ইতিবৃত্ত।

শিল্পী নন্দলাল বর্তমান সময়ের ভারতীয় শিল্প-ধারায় বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এই বিতর্ক শুধু তাঁর চিত্রকর্ম বা সৃজনভাবনার উৎসেই নয়, শিল্প-সংগঠনের

নন্দলাল—সত্যজিৎ চৌধুরী। অরুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৬। সত্তর টাকা।

বন্য নির্মিতির ভাষানির্ণয়েও প্রযোজ্য। অনেকের মতে, নন্দলাল আধুনিক নন। কারণ 'তিনি কেবল গড়েই গেছেন, ভেঙে গড়তে পারেন নি।' আবার কেউ মনে করেন, 'বেঙ্গল স্কুলে'র গতিহীন বৃত্তবন্দী শৈলীর শিকার শিল্পী নন্দলাল। প্রাজ্ঞ পণ্ডিতজনের একটি অংশ আবার শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বুঝে নিতে চান নন্দলালের পরি-প্রেক্ষিত। অথচ এই নানা দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য শুধু একটি ক্ষেত্রেই প্রবল—তা নন্দলালের শিল্পকর্মের সঙ্গে শিল্পী-সত্তার বিচারে খণ্ডবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা বা পূর্বধারণার বিশ্বাসে, স্থির সিদ্ধান্তের সংকীর্ণ চেষ্টা। অবশ্য শতবর্ষে নন্দলালের চিত্রচর্চা ও ভাবনার (প্রদর্শনী মারফত) উপস্থিতি অনেকেরই পূর্বধারণার বদল ঘটাতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, আরোপিত ধারণার বশে আমরা যে নন্দলালকে চিনতে শিখেছিলাম, শতবর্ষের প্রদর্শনী ছিল সেই বিচ্ছিন্ন খণ্ডভাবনার বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার। শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের "ভারত-শিল্পী নন্দলাল" নামের চার খণ্ডের (এ পর্যন্ত তিন খণ্ড প্রকাশিত) শিল্পী ও তৎকালীন ভারতীয় শিল্পী ও শিল্প-ইতিহাস সম্পর্কিত নানা তথ্যের সুবিশাল আকরগ্রন্থও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি করে। কারণ পঞ্চাননবাবুর গ্রন্থ শুধুমাত্র শিল্পী নন্দলালকে চিনতে সাহায্য করে তাই নয়, ভারতশিল্পের প্রেক্ষায় নন্দলালের ভূমিকার গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচিত্র ঘূর্ণীর মধ্যে যিনি জীবনকে স্থাপন করার সাহস রাখেন, স্রোতের ধারায় যিনি নিজেকে ক্রমবিস্তারে নতুন-নতুন করে গড়ে তুলতে পারেন, তাঁর ভাঙা এবং গড়াও নির্বাক সময়ের অনন্তগতির মতই স্থিতধী স্থির। ভারতীয় চিত্রধারায় নন্দলাল আধুনিক নন—এই বোধে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের শিল্প- বা আধুনিকতা-বোধ সম্পর্কেই সন্দেহ হয়।

সত্যজিৎবাবুর "নন্দলাল" গ্রন্থের সূত্রপাত 'গুরুর পাশে' এই শিরোনামে। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল —এই দুই শিল্পী, গুরু-শিষ্য সামাজিক অবস্থানের বিবিধ বৈপরীত্য সত্ত্বেও দীর্ঘ সময়ের আত্মিক বন্ধন, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার ভাববিনিময় এবং শিল্পী-ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সাফল্যে পরস্পর যেন অভিন্ন-আশ্লিষ্ট। সত্যজিৎবাবু ভারতীয় চিত্রকলার তৎকালীন প্রেক্ষাপট নানা তথ্য-বিশ্লেষণের ব্যবহারে মূর্ত করেছেন। আর এই আবহের সঙ্গেই যুক্ত করতে চেয়েছেন ভারতশিল্পের দুই প্রধান চরিত্রকে। অবনীন্দ্র-নাথকে আশ্রয় করেই নন্দলাল ফলবান হয়েছেন। আবার অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানপ্রতিম গুণী ছাত্র নন্দলালের মধ্য দিয়েই সার্থক করতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্ন আর বিশ্বাসের বিস্তারী গঠনরূপ। অথচ পারস্পরিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, এমনকী সার্বিক নির্ভরতা সত্ত্বেও নন্দলালের স্বকীয় পথ নির্মাণের কিংবা ভাবনা ও বিশ্বাসের জগৎ ক্রমশ গুরুর থেকে ভিন্ন পথে বাঁক নিয়েছে। লেখক সামাজিক-রাজনৈতিক বিচারে এই দুই চরিত্রের নানাবিধ শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বিকাশের রূপ-রেখা এঁকেছেন সহজ ভাষায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন ঘটেছে অতি দ্রুত। মন্তব্যের চকিত চমক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই সিদ্ধান্তে স্থির। ফলে প্রায় পদে-পদে সন্দেহ জিজ্ঞাসায় বিতর্কিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে। এ ছাড়াও 'গুরুর পাশে' অংশে নন্দলালের জীবনী বা চিত্রচর্চা বা চিত্রভাবনার প্রচল ঘটনাকেই লেখক স্বচ্ছন্দ ভাষায় গেঁথেছেন। নতুন কোনো তথ্য বা ব্যাখ্যায় ভাবনার অবকাশ নেই বললেই চলে। তথ্য-গত বিভ্রান্তি বিতর্ক সৃষ্টির সহায়ক। যেমন, '১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যক্ষ হ্যাভেল অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেলেন, আর্ট স্কুলের দায়িত্ব নিলেন অবনীন্দ্রনাথ' (পৃ ৭)। এই প্রসঙ্গক্রমেই লেখক মন্তব্য করেছেন, 'ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থা করা হল। দেশী শিল্পের রীতিপদ্ধতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য পাটনা থেকে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে আনালেন' (পৃ ৭)। শিল্পী

এবং সমালোচক শোভন সোম তাঁর "ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পশিক্ষা : ১৮৩৯-১৯৪৭" শিরোনামের রচনায় লিখেছেন—'অবনীন্দ্রনাথ কাজে যোগ দেন উনিশ শ পাঁচের পনেরো অগস্ট আর আর্নেস্ট বন্ধ উন্মাদাবস্থায় পরের বছরের জানুয়ারির শুরুতেই ইংল্যানডে চলে যান' ("অনুষ্টুপ", প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ ৮৬)। তথ্যমতে হ্যাভেল ১৯০৬-এর জানুয়ারিতেই ইংল্যানডে চলে যান। শোভনবাবুর তথ্য অনুসরণে দেখা যাচ্ছে—'উনিশ শ ছয়ের এপ্রিলে লতাপাতা আঁকা শেখাবার জন্য ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা নিযুক্ত হন। ঈশ্বরীপ্রসাদ (১৮৭০-১৯৪৯) ছিলেন মুঘল চিত্রকলা থেকে উদ্‌গত পাটনা কলমের কৌলিক চিত্রকর' ("অনুষ্টুপ", প্রথম বর্ষ, ১৯৮৬, পৃ ৮৭)। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সত্যজিৎবাবু এবং শোভনবাবু উভয়ের লেখায় হ্যাভেল দেশে ফিরে যাবার পরই ঈশ্বরীপ্রসাদ এসেছিলেন তেমনি বিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু এই তথ্যটি কি সঠিক ?

আর্ট স্কুলের এনগ্রেভিং ক্লাসের ছাত্র, পাড়ার বন্ধু সত্যেন বটব্যালের সঙ্গে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। অস্থায়ী অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের কাছ হয়ে নন্দলাল স্থায়ী অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের কাছে এলেন। কাজে সন্তুষ্ট হয়ে হ্যাভেল নন্দলালের নিয়ম মোতাবেক পরীক্ষা নিলেন, পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক ঈশ্বরীপ্রসাদ এবং হরিনারায়ণবাবু। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন থেকে কিছু আঁকতে বলায় নন্দলাল গণেশের ছবি আঁকলেন। ছবির নাম "সিদ্ধিদাতা গণেশ" (১৯০৫)। অবনীন্দ্রনাথ পরীক্ষকের মতামত জানতে চাইলে ঈশ্বরীপ্রসাদ জানালেন—'হাথ-পুখ্‌তা হৈ।' এই তথ্য আমরা পাই শ্রদ্ধেয় কানাই সামন্তের "শ্রীনন্দলাল বসু" গ্রন্থের ১৯-২০ পৃষ্ঠায়। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের "ভারতশিল্পী নন্দলাল" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় একই তথ্য সংযোজিত রয়েছে। এ ছাড়াও অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতের শিল্প ও আমার কথা" গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় পাই—'ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করার জন্য হ্যাভেল সাহেব অবনীবাবুকে একজন সহকারী শিক্ষক এনে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন মুঘল চিত্রশৈলীর শেষ ধারাবাহক বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ। তাঁকে আনা হয়েছিল পাটনা থেকে।' ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের এই মুহূর্তটি অনেক কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ সময় নিয়ে, শিল্পী-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি নিয়ে এই তথ্যগত বিভ্রান্তি অনভিপ্রেত। এ ধরনের বিভ্রান্তিও ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন কিংবা ঐতিহাসিক পট বিশ্লেষণের প্রতিবন্ধক।

সত্যজিৎবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় শিল্পবোধ প্রসারণে আন্তরিক। মননশীল পাঠকের সঙ্গে শিল্পভাষার অনভিজ্ঞ অভাজনকে রসিক করে তুলতেও আগ্রহী। কিন্তু শিল্পনির্মাণের প্রেক্ষা কিংবা সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণে কিছু নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বিস্তারী যুক্তি-ব্যাখ্যায় তেমন পূর্ণতা পায় না বলেই নানা জিজ্ঞাসায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেমন, অবনীন্দ্রনাথের মুঘল মিনিয়েচারের প্রতি অন্তরের আকর্ষণকে ব্যাখ্যা বা যুক্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখ করেন, 'দেশী ছবির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের অন্তরের টান ছিল মুঘল মিনিয়েচারে। মুঘলসিদ্ধ বলতেন নিজেকে। একটু তলিয়ে দেখলে এই প্রবণতার কারণ তাঁর শিক্ষা এবং মেজাজেই নিহিত বোঝা যায়। স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় শিল্পে য়ুরোপীয় প্রভাবের সূত্রপাত হয়েছিল মুঘল আমলে, আকবরের সময় থেকে। মুঘল মিনিয়েচারের সূক্ষ্ম অলংকরণে য়ুরোপীয় এনগ্রেভিং এবং ছবির মধ্যে স্পেস বা আকাশের আবহ ব্যবহারে য়ুরোপীয় পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা অনেক দূর এগিয়েছিল। বাধা না পেলে এই যোগাযোগ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পের স্বাভাবিক সম্মিলনের পথ খুলে দিতে পারতো হয়তো' (পৃ ৯)। এই মন্তব্যের পরেই লেখক অবনীন্দ্রমানসের বিশ্লেষণে য়ুরোপীয় আঙ্গিকে শিক্ষিত রুচিকে ভারতীয় অন্যান্য কলম অপেক্ষা মুঘল কলমের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে নিবিষ্ট হবার কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। কিন্তু সত্যিই কি এই ভাবনায় আমরা

কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে স্থিত হতে পারি? এ বিষয়ে বিশদতথ্যভিত্তিক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তবু সংক্ষেপে বলা চলে মুঘল কলমে য়ুরোপীয় প্রভাব এবং অবনীন্দ্রনাথের য়ুরোপীয় মানসিকতার সাযুজ্য বা ঐক্যসূত্র অপেক্ষা, মুঘল শৈলীর বর্ণময়তা এবং সূক্ষ্ম রেখাশৈলীর কাব্যিক ছন্দোময় অভিব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের প্রাথমিক য়ুরোপীয় যান্ত্রিক শিক্ষার নীরস সাধনার বিপরীতে মুক্তির আস্বাদ বা আশ্বাস যুগিয়েছিল। শিক্ষক গিলার্দি বা পামারের কাছে শিক্ষাপর্ব শেষ হলেও অবনীন্দ্রনাথের মন তুষ্ট হয় নি। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'দেশী রাধিকা হল না, সে হল যেন মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের রাতে ছেড়ে দিয়েছি।' অর্থাৎ তিনি য়ুরোপীয় প্রভাবকে ভুলতে বা মুক্ত হতে চাইছিলেন। মুঘল কলায় তাঁর অনুরাগ য়ুরোপীয় রীতির জাদু নয়, মিনিয়েচারের সুচারু কাব্যময়তা। আর সত্যজিৎবাবু যাকে ছবির মধ্যে স্পেস বা আকাশের আবহ ব্যবহারের পদ্ধতি বলতে চেয়েছেন তা বোধহয়, 'অবকাশ' এই অর্থকে চিহ্নিত করতে চায়। কিন্তু এই 'স্পেস' যা আক্ষরিক অর্থে 'আকাশ' হলেও চিত্রের ভাষায় এই 'স্পেস'-ই হয়ে ওঠে স্তোত্রনাময় 'অবকাশ'। এই অবকাশ কি প্রাচ্যেরই বিশিষ্ট সম্পদ নয়? য়ুরোপীয় আধুনিক শিল্পভাবনা যার প্রেরণায় বহুদূর সৃজনগতিমুখের সন্ধান পেয়েছিল!

"নন্দলাল" গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের বিষয় 'ভারতীয় আধুনিক শিল্পী'। ১৮ পৃষ্ঠা থেকে ১১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভারতীয় ঐতিহ্য-আধুনিকতা এবং শিল্পী নন্দলালের আধুনিকমনস্কতার পরিচিতি লেখক নানা বিস্তারে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক-রাজনৈতিক এবং তৎকালীন শিল্প-আবহের প্রেক্ষিত বিশ্লেষণে সামগ্রিক ভাবনার রূপরেখা স্পষ্ট করেছেন। সত্যজিৎবাবুর গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হবার কারণে অনেক সময় একই প্রসঙ্গ বারবার বিবিধ রচনায় মিশে গেছে। ফলে কখনো তা ধারাবাহিক পঠনে বাহুল্য মনে হতে পারে। 'ভারতীয় আধুনিক শিল্পী' এই পর্বেও নন্দলালের ছাত্রাবস্থার ঘটনার প্রসঙ্গ এসেছে এবং তা ক্রমপরিণতির স্তরে শিল্পী নন্দলালের দ্বিতীয় ভুবন অর্থাৎ রবীন্দ্রসান্নিধ্য তথা শান্তিনিকেতনপর্বের পূর্ণতার বিশ্লেষণী বিস্তারে প্রমাণ করেছেন একদিকে ভারতীয় চিত্রভাবনার সংকটকাল, অন্যদিকে এই সংকটকে আত্মস্থকরণের মাধ্যমে আধুনিকতার নব্যবিস্তার। সহজ স্বাচ্ছ ঘটনাপরম্পরায়, কাহিনীবিন্যাসের গতিশীল ধারায় লেখক নন্দলালের পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কিন্তু কখনো-কখনো এই গতি, দ্রুত বিশ্লেষণের তাগিদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবং ধারাবাহিক ভাবনা বা চিন্তনের সূত্র ছিন্ন হয়ে দ্রুত মন্তব্য পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্তের অনুগামী হয়ে ওঠে। আরো একটি জিজ্ঞাসা—নন্দলালের শিল্পক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আন্তরিক তাগিদ এতই পক্ষপাতী যে এর কারণে সমসাময়িক শিল্পী সুহৃদগণ যেন শুধুমাত্র ম্লানই নন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অক্ষম নির্জীব প্রতিপন্ন হন। অবনীন্দ্রনাথ, হ্যাভেল থেকে শুরু করে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব এবং এঁদের সাহচর্যে ভারতীয় দেশকাল-ঐতিহ্যের উৎসকে জানবার সুযোগ হয়েছিল নন্দলাল-এর। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ এবং নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে, বিশেষত অজন্তার শিল্প-আখ্যান আর ভারতীয় ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন অধীত জ্ঞানের সাহায্যে। সত্যজিৎবাবুর রচনায় এই অন্বেষার নানা দিক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিনি যখন এই মন্তব্য করেন—'টেম্পেরা অবনীন্দ্রনাথ যে এড়িয়ে গেছেন—মনে হয় সে তাঁর এই মেজাজেরই জন্য। টেম্পেরায় আলোর সূক্ষ্ম হেরফের ফোটানোর সুযোগ আপেক্ষিকভাবে কম। ছবির মধ্যে স্পেস বা আকাশ এবং বস্তুর সম্পর্কের টেনশন জলরঙ বা তেলরঙে তাৎপর্যময় করে তোলায় অনেক স্বাচ্ছন্দ পাওয়া যায়।' তখনই সন্দেহ ঘনায়। মাধ্যম ব্যবহারের রীতি এবং নির্মাণগুণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার

অভাব এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ জলরঙ এবং তেলরঙকে তিনি 'তাৎপর্যময় করে তোলায়' একই মাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু নয়। বরঙ তেলরঙের ব্যবহারের প্রার্থিত তাৎপর্য টেম্পেরায় সম্পূর্ণই মেলে। শিল্পী বতিচেল্লি থেকে শুরু করে আমেরিকান শিল্পী অ্যানড্রু. ওয়েথ এঁদের টেম্পেরায় আলোর সূক্ষ্ম হেরফের ফোটানোর অফুরন্ত প্রয়োগনৈপুণ্য ক্ষণে-ক্ষণে বিস্মিত করে। আমাদের স্বদেশের শিল্পী গণেশ পাইনের টেম্পেরায় আলোছায়ার, বুনোটের আশ্চর্য কারুকৃতির বিস্ময়ের ঘোর কোন্ অংশে কম?

নন্দলালের ব্যক্তিজীবন এবং শিল্পী-জীবনের সংকটকাল বারবার এসেছে। কিন্তু গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরিমণ্ডল ছিন্ন করে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তথা শান্তিনিকেতনের আবহে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আহ্বানে ছিল এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংকট। সত্যজিৎবাবু 'ভারতীয় আধুনিক শিল্পী' প্রসঙ্গকথায় এই সংকটকেই তুলে ধরেছেন। বিষয়টি শুধু নন্দলালের জীবনের আত্মগত সমস্যা নয়, ভারতীয় চিত্রভাবনার প্রসার আর তাৎপর্য নিরূপণেরও এক সন্ধিক্ষণ। লেখক এখানে নন্দলালের স্বদেশচেতনাকে শান্তিনিকেতনপর্বের মাটির ডাক হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান। বিষয়ভাবনাটি খুবই বিতর্কিত আর সেই কারণেই তাঁর ভাবনার দৃষ্টিকোণের মূল্য স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়—নন্দলাল কি শুধুই স্বদেশচেতনার স্বচেতন বোধেই উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন? না, বাহ্যিক ঘটনার কার্যকারণপ্রভাব তাঁকে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করেছিল? আসলে শান্তিনিকেতনে চিত্র ও সংগীত ভাবনা-বিকাশের দীর্ঘ ঘটনাক্রমকে বাদ দিয়ে শুধুই নন্দলালের ভূমিকার আলোচনায় শিল্পী নন্দলাল হয়তো প্রতিভা বা মহিমায় অন্বিত হন সত্য, কিন্তু তৎসময়ের রবীন্দ্রভাবনা এবং এই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিজনের ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য যেমন স্বীকৃতি পায় না, অন্যদিকে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গতাও ব্যাহত হয়।

প্রচলিত ধারণা বা ব্যক্তিবিশেষের সংকীর্ণবোধে নন্দলাল ভারতীয় শিল্পে অনাধুনিক, স্বভাবশিল্পীর পরিচয়ে পরিচিত রইলেন। সত্যজিৎবাবুর "নন্দলাল" মূলত সেই ধারণার বিপক্ষে, বিস্তৃত মূল্যায়নের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রয়াসী। কিন্তু প্রশ্ন হল, মতামত বা বিশ্লেষণ যদি আবেগবর্জিত দৃঢ় ঘটনাপরম্পরার সংঘর্ষে সার্বিক পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তা গ্রহণীয় হয়ে ওঠার মস্ত অন্তরায় সৃষ্টি করে।

শিলাইদহে রবীন্দ্রসঙ্গে নন্দলালকে উদ্বোধিত করেছিল। নন্দলালের উক্তিতে—'আমাদের জীবনে গ্লিম্পস দিয়ে গেলেন তিনি। তাই পাথেয় হয়ে রইল সারা জীবনের। আমাদের কাছে তিনি কল্পলোকের দরজা খুলে দিয়েছেন। গান-কবিতা-শিল্প যাই বলো সব হয়েছে প্রকৃতি থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশদেখা চোখ নিয়ে আমাদের মন্ত্র দিলেন সেই প্রকৃতিকে তার মর্মরূপে দেখবার।' অসিত হালদারের অবিরত চিঠির ধাক্কায় নন্দলাল শান্তিনিকেতন সম্পর্কে স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। পাশাপাশি কলকাতার শিল্পপরিমণ্ডলের কিছু অনভিপ্রেত ঘটনাবলী তাঁকে অনেকাংশেই আহত করেছিল। এমনই এক চূড়ান্ত সংকটে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বাস্তবায়নের সুযোগ পান। এই সুযোগকেই তিনি আন্তরিক টানে গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশচেতনার শিকড় খোঁজা অপেক্ষা প্রাণের মুক্তি পরিবেশ প্রসারতার স্বপ্নই নন্দলালকে শান্তিনিকেতনমুখী করেছিল।

নন্দলালের চিত্রনির্মাণের বিষয় ও গঠনবোধকে সত্যজিৎবাবু সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। যেমন, 'মূল্যায়ন খুবই একপেশে হয়ে পড়ে যদি আমরা ভুলে যাই নন্দলাল একই নিষ্ঠায় তাঁর জীবনযাপনের পরিবেশ থেকে, প্রাত্যহিক দেখা জগৎ থেকে নিরন্তর ছবির বিষয় নিয়েছেন। ভূদৃশ্য, চোখে-দেখা মানুষজনের চরিত্র, পশুপাখি অবিরল আসে তাঁর ছবিতে। এমনকী পুরাণ-আশ্রিত ছবিতেও চরিত্রের আদল তুলে দিয়েছেন বাস্তব থেকে' (পৃ ৪৫)। শান্তিনিকেতনপর্বে ছবির চরিত্রের এক বিচিত্র পরিবর্তন সূচিত হয়। সত্যজিৎবাবুর রচনায় তার সূত্রও আছে। কিন্তু এই বাস্তবতাবোধ থেকে রূপতন্ময়তায় আত্মনিয়োজনের বিশ্লেষণী দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। য়ুরোপীয় আধুনিকতার যুক্তিবুদ্ধিকে লেখক নিজস্ববোধের ছায়ায় মিশিয়ে দিতে চান শিল্পী নন্দলালের চিত্রভাবনার প্রাসঙ্গিক বৃত্তে। শিল্পীর তাৎপর্যময় উক্তির মধ্যে পাই সৃজনের অপূর্ণতা, অস্থিরতার দোলাচল মানসভঙ্গি—'যা-কিছু এঁকেছি তার তিন ভাগ কিছু হয় নি। মানুষের মতো মানুষ, গাছের মতো গাছ হয়েছে—ছবি হয় নি তখন। তার চেয়ে পট ভালো।' ("শিল্পীর মনঃ শিল্পীর চোখ", কানাই সামন্ত, নন্দন ১৯৮২, কলাভবন, পৃ ৯)।

যামিনী রায়কে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছিলেন, 'আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে।' ২৫.৫.৪১-এর চিঠির পর কবি ৭.৬.৪১-এর চিঠিতে লিখছেন, 'কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলছিলেন বলে আমার বোধ হয় নি। সেইজন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম—তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে।' নন্দলাল কাছে থাকতেও কবি যামিনী রায়কে নির্ভর করেছিলেন কেন? তবে কি আধুনিক ভাষা বা ভাবনার ব্যবধান নন্দলালের মধ্যে উপস্থিত, তিনি তা অনুমান করেছিলেন? কিংবা নন্দলালের মনের দ্বন্দ্ব আর সংশয়বোধ এই আধুনিককে ঠিক গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না? নন্দলালের প্রতিভা এবং শিল্পী-সক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানিয়েও আধুনিকতার নব্যবোধ থেকে তাঁর দূরত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, আর সেই কারণেই যামিনী রায়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন নব্যগঠনকাঠামোর প্রার্থিত রূপ? অবশ্য এ সবই অনুমান। তবে যামিনী রায়ের প্রতি যাঁরা যুক্তিহীন ভাবপ্রবণ, বিপরীতে নন্দলালের প্রতি শ্রদ্ধায় যাঁরা প্লুত—এই উভয় পক্ষই শিল্পের মূল সত্যকে প্রতিষ্ঠার তাগিদ বা প্রয়োজন এখনো অনুভব করলেন না। পূর্বকল্পিত বিশ্বাসের ধারায় মূল্যায়নের পরিবর্তে বাঁধা বৃত্তে সত্যকে আবৃত করলেন। সত্যজিৎবাবুর "নন্দলাল" অনেকাংশেই সেই তিমিরবিনাশী প্রচেষ্টার লক্ষ্যে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বিলাসীবৃত্তকে অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন।

"নন্দলাল" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় 'জাপানের প্রেরণা।' গুরু অবনীন্দ্রনাথ, শিষ্য নন্দলাল এবং তৎকালীন 'বাঙলা ঘরানা' তথা ভারতীয় চিত্রভাবনায় জাপানের প্রভাব।

ভারতশিল্পভাবনার মতো জাপানেও একটা সময়ে ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার বিরোধ বেধেছিল। আধুনিকতা এক্ষেত্রে শুধু নব্য মানসিকতার অর্থেই নয়, পাশ্চাত্যমুখী যুক্তিহীন গ্রহণের আগ্রাসীপ্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। গ্রহণ আর বর্জনের মতান্তরে ঐতিহ্যের প্রতি নিবিড় নিষ্ঠায় যিনি হাল ধরলেন, তাঁর নাম ওকাকুরা তেনশিন।

রবীন্দ্রনাথ জাপানভ্রমণকালে ভাইপো অবনগগনকে চিঠির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন জাপানের চিত্রভাবনার মূল্য। ঘর থেকে বাইরে বেরোবার যে আহ্বান, তাতে ছিল সংকটমোচনের অভীপ্সা। নন্দলালকে তিনি সঙ্গী করেন জাপানভ্রমণে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলেই জাপানের শিল্প ও নন্দনবোধ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর রচনার এই অংশে ইতিহাসের তথ্যে, সামাজিক বিশ্লেষণের যুক্তিবাদী ঘেরে প্রকাশ করেছেন নন্দলালের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বিকাশে জাপানি শিল্পী ও শিল্পতত্ত্বের প্রগাঢ় প্রভাব। রচনার এই অংশে

লেখক দেখিয়েছেন চীন-জাপানের শিল্পভাবনা কেমন-ভাবে ঐতিহ্যবিচ্যুত হয়ে মার্কিনি প্রভাবে মিশিয়ে দিচ্ছে নিজেকে। এই প্রভাবকে নন্দলাল মন থেকে মানতে পারেন নি। ১৯২৪ সালের ৮ মে চীন থেকে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে এই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পী বিনোদবিহারীর জাপান অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গকেও লেখক তুলে ধরেছেন সংকটের উদাহরণচিত্র হিসেবে। রচনাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়েছে, লেখক 'ভারতীয় আধুনিক শিল্পী' আলোচনায় ১১৬ পৃষ্ঠার 'আন্তর্জাতিক আধুনিকতার' স্বরূপ বিশ্লেষণকে যদি উপরি-উক্ত স্থানে আনতেন কিংবা এই দুই বিশ্লেষণের যুক্ততা রাখতেন তবে তা হয়তো আরো বেশি মাত্রায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হত।

গ্রন্থের শেষ বিষয় 'নন্দনভাবনা'। নন্দলালের শিল্পচেতনার স্বরূপ লেখক 'নন্দনভাবনার' প্রেক্ষিতে দেখাতে চেয়েছেন। শিল্পী নন্দলালের "শিল্পকথা" বা "শিল্পচর্চা" গ্রন্থ নন্দনতত্ত্বের তত্ত্বগত আলোচনায় শুধু সমৃদ্ধ নয়, শিল্পী-ব্যক্তিত্বের অধীত অভিজ্ঞতার বাস্তব আধার। সে কারণেই অবনীন্দ্রনাথ কিংবা পরবর্তী সময়ে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রচনায় শিল্প-ভাবনা যেমন পরিশীলিত তত্ত্ব-প্রজ্ঞানে পূর্ণ, নন্দলালের রচনা তেমন নয়। কিন্তু নন্দলালের শিল্পভাবনা যেন কথকের ভঙ্গিতে শিল্পের সৃষ্টি আর নির্মাণের গ্রন্থি-মোচনের সহজপাঠ।

১৯২২-২৪ সালের দিকে শান্তিনিকেতনে প্রাথমিকভাবে শিল্পশাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন নন্দলাল। সহযোগী ছিলেন অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং হরিদাস মিত্র মহাশয়। এঁদের মধ্যে একমাত্র নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা করতেন। অনুমান করা হয়, এই সময় থেকেই নন্দলালের শিল্পশাস্ত্রের প্রতি গভীর আগ্রহ জন্মায়। এই তথ্য আমরা পাই শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের "ভারতশিল্পী নন্দলাল" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত সূত্রের ভিত্তিতে। নন্দলাল ছাত্রাবস্থায় নানা মনীষীর সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের সান্নিধ্য এবং ভারতশিল্পের ব্যাখ্যায় নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তবে ভারতশিল্পের মর্মকথা এবং সত্যদর্শন-সূত্র 'হ্যাভেল গুরু'র শিল্পচিন্তার পথ ধরেই এসেছিল। হ্যাভেলের "দি আইডিয়ালস অব ইনডিয়ান আর্ট" গ্রন্থে শিল্পচিন্তার যে পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে, নন্দলালের ভাবনা তারই অনুবৃত্তি। অবশ্য এই ধারণা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তবে জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই আলোচিত হতে পারে নন্দলালের নন্দনচেতনার উৎস বা মৌলিকতার দিশা।

'নন্দনভাবনায়' লেখক সহজতায় তুলে ধরেছেন শিল্পী নন্দলালের শিল্পভাবনার গতিপ্রকৃতি। নানা আবহের অভিজ্ঞতা ছোটো-ছোটো শব্দের উপলব্ধিকে চূড়ান্ত প্রয়োগে প্রকাশ করেছেন শিল্পী নন্দলাল। কিন্তু এই ধারণার বীজ নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা আর মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকেই শুধু পেয়েছেন? উপরি-উক্ত হ্যাভেলের ভাবনার যে সূত্র পঞ্চাননবাবু উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে সত্যজিৎবাবু কোনো বিশ্লেষণী আলোচনার প্রকাশ করেন নি। এ ছাড়াও শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিক্ষাদর্শ, শিল্প-শিক্ষার পদ্ধতিগত বিন্যাসের যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছিল, তাও কিন্তু নন্দনভাবনারই সগোত্র। অথচ 'নন্দনভাবনা'র প্রসঙ্গে এসব দিকই অনালোচিত থেকে গেছে। 'নন্দনভাবনা'র এ এক মস্ত বড়ো অসম্পূর্ণতা।

শিল্পী নন্দলালের শিল্প এবং জীবনের বৃহত্তর আর মহত্তর বিকাশের নানা দিক নিয়ে বহুদিন ধরেই আলোচনা চলছে। প্রাজ্ঞজনে নানা বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের "ভারতশিল্পী নন্দলাল" শুধু ব্যক্তি শিল্পী নন্দলাল নয়, সমসময়ের শিল্প আবহেরও ঐতিহাসিক দলিল। সত্যজিৎ চৌধুরীর

"নন্দলাল" প্রকাশনার তাৎপর্য সমসময়ের দৃষ্টিতে শিল্পী এবং শিল্পের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা। লেখকের অনু-সন্ধানী দৃষ্টি, আন্তরিক শ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই স্বীকার্য। পাশাপাশি এই ধরনের অব্যবসায়িক বা সাফল্যের অনিশ্চয়তার দায়কে মেনে নিয়েও প্রত্যয়ী প্রকাশনার জন্য অরুণা প্রকাশনীকেও সাধুবাদ দিতেই হয়। মতান্তর থাকলেও বিবিধ জিজ্ঞাসায় শিল্পী নন্দলাল তথা ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিক ধারার বহমানতার সূত্রসম্পর্ক জানার কারণেই এই গ্রন্থ রসিকজনের অবশ্যপাঠ্য। অবিরত জিজ্ঞাসার মধ্যেই আগামী ভবিষ্যতে প্রার্থিত উত্তর মিলবে এ আশা বোধকরি অসঙ্গত নয়।

'কবিতার কতো না আকাশ'

মতি মুখোপাধ্যায়

স্বনামধন্য কবি নুরুল আরেফিনের দুটি কবিতা-সঙ্কলনের ব্যাপারে একটা বিষয় আমাকে কৌতূহলী করেছে, সেটি হল রচনা ও প্রকাশের মধ্যেকার দূরত্ব। "অস্তিগড়ী গায়েনে"র রচনাকাল ১৯৫৮-৬২, 'ভূমি-দাসের খেদ' ১৯৬৩। অথচ বই দুটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬র শেষ দিক করে। কারণ হিসাবে কবি 'কার্যো-পলক্ষ্যে অন্যত্র যাওয়ার' কথা বলেছেন। "ভূমিদাসের খেদ"-এর কবিতাগুলি সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে রচিত, 'অস্তিগড়ী গায়েনের' কবিতা সম্ভবত বাউল-দেশে [তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান]। রচনা ও প্রকাশের মধ্য-কালীন দীর্ঘ সময়, রচনাকাল, তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি একজন সচেতন কবির চেতনায় যে অভিঘাত সৃষ্টি করে তার গুরুত্ব কম নয়।

অস্তিগড়ী গায়েনে মোট একত্রিশটি কবিতা সন্নিবেশিত। অস্তিত্ববাদী চিন্তায় আক্রান্ত মানসের প্রতিফলন এইসব কবিতায় যার ভিতরে জঁা পল সার্ত্রের 'concrete individual being here and now' অনুসরণে 'অস্তিত্বের মিনারে একা', Martin Heideggar-এর 'The ecstatic standing in the truth of being' কবিতার প্রতিফলন যেমন আছে, তেমনি রয়েছে অ্যালবেয়ার কামুর অনুভবে 'মধ্যরাতের ঘণ্টা' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা। প্রেমে পরাজয়ে জীবনে যে অনিবার্য অনন্বয়, তার প্রকাশ এইভাবে : 'সকল সম্পর্কচ্যুত তুমি, / অন্ধকার মধ্যরাত্রে ওই / বাতিজ্বলা জনপদ থেকে / একাকী একাকী বহুদূরে / দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রকে দেখো / নিজেকে বাতাসে শূন্যে ছুঁড়ে / ফেলার পূর্বাহ্নে দেখো তারে, / উজ্জ্বল মানুষ তুমি এক / অস্তিত্বের উত্তুঙ্গ মিনারে।' 'মিনারে সঞ্চারী' নামের কবিতায় কবি অনায়াসে বলেন, 'জাগতে চাই না আমি হট্টগোলে শহরী দরবারের / জানতে চাইনা আমি জীবনের কথা /

অস্তিগড়ী গায়েন—নুরুল আরেফিন। বুকস্ এণ্ড বুকস্ প্রাইভেট লিঃ, ১২ অক্ষয় দাস রোড, ঢাকা-৩। ১৯৮৬। পৃ ৬৩। পনের টাকা। **ভূমিদাসের খেদ**—নুরুল আরেফিন। বুকস্ এণ্ড বুকস্ প্রাইভেট লিঃ, ১২ অক্ষয় দাস রোড, ঢাকা-৩। ১৯৮৬। পৃ ৪২। পনের টাকা। **কোলকাতা প্রিয়কোলকাতা**—আবু আতাহার। সুমন, ১২ বসন্ত বসু রোড, কোলকাতা-৭০০০২৬। ১৯৮৮। পৃ ৫০। সাত টাকা। **যন্ত্রণার পুঁজি, কবিতার অস্ত্র**—বিপ্লব মাজী। প্রকাশনা, মেদিনীপুর। ১৯৮৮। পৃ ৩৫। আট টাকা। **ও সমুদ্র**—বিপ্লব মাজী—প্রকাশনা, শরৎপল্লী, মেদিনীপুর। ১৯৮৭। পৃ ৪৪। পাঁচ টাকা। **উষ্ণমণ্ডলের রাত**—বিপ্লব মাজী। প্রকাশনা জলধর, মেদিনীপুর। ১৯৮৫। পৃ ৪৮। আট টাকা। **গোলাপেরা শিশির চুম্বিত**—বিপ্লব মাজী সম্পাদিত। প্রকাশনা, শরৎপল্লী, মেদিনীপুর। পৃ ৮৬। পনের টাকা। **বিষের মধ্যে সমস্ত শোক**—শক্তি চট্টো-পাধ্যায়। মিত্রান্দা, কলকাতা-৭০০০৫৪। ১৯৮৮। পৃ ৪০। দশ টাকা। **বাঁশফুল ও এইসব নির্জনতা**—দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। প্রকাশনা : মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়, ৪৫ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৪০। ১৯৮৮। পৃ ৩২। পাঁচ টাকা। **কারাগারের কাব্য**—হো চি মিন। রূপান্তর সুমীর সিরাজ। উন্মেষ প্রকাশনী, ১/২ এ, চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩। ১৯৮৮। পৃ ৭১। কুড়ি টাকা।

রাজা আর যত প্রজাদেরও / চাই শুধু হারিয়ে যেতে চাই / জীবনের যত কাজ কোনোটা না শেষ করে / জন্মের আগের এক আঁধার আবেশে।'

'অস্তিগড়ী গায়েনে' অস্তিবাদী যে কাব্যসঙ্গীত তার মূলে একটা তীব্র আলোড়ন, হয়তো যা জীবন-বোধ, সমাজচেতনা, আশা, বিশ্বাস ইত্যাদির পরিবর্তিত অবস্থার কারণে। সামাজিক রাষ্ট্রিক যে কোনো কারণেই হোক মূল থেকে ছিন্ন হচ্ছে মানুষী সত্তা; মৌল সত্তার বিভক্তিকরণ কিংবা decomposition থেকেই জন্ম নিচ্ছে alienation যার প্রভাবে মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করে, সামাজিক থেকে একাকিত্বে নির্বাসন দেয়। কবি আরেফিন স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন, 'রোজ পথে এত লোক দেখি, পথে তবু একা একা, / এত জল নিয়ে নদী তবু যেন তৃষ্ণার্ত হৃদয় তার / অন্য কোনো নদী আঁকে বালুকায় মূর্ত বিশ্বাসের— / জল আছে, গতি আছে, স্রোতে ও গড়াতে নেশা যার।'

কাল ও স্থানের পরিবর্তনে কবি-মানসে যে রূপান্তর ঘটে 'ভূমিদাসের খেদ' তার সাক্ষ্য দেয়। এই বইয়ের কবিতা সিন্ধু অববাহিকায় বসবাসকালীন রচনা বলে জানা গেছে। অস্তিগড়ী গায়েনের সঙ্গে একটা মৌল ভেদ লক্ষণীয়। এখানে একাকিত্ব থেকে সামাজিকে প্রত্যাবর্তন। একুশটি কবিতার অন্যতম 'বিকলাঙ্গটার প্রার্থনায়' সোচ্চারে বলেছেন, 'প্রভু, আমাকে বিস্তার কর জীবন মিছিলে, / আদিকালের অগ্নি, জল, বাতাসের মত / ভোর থেকে— / দিন থেকে— / সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, থেকে ভোরে / আমাকে বিস্তার কর তোমার পদতলে, / দীর্ঘতম জীবন মিছিলে।' আসলে কবি তাঁর ইচ্ছা সমর্পণ করেছেন পরম শক্তিপীঠ জনতায়, সমর্পিত মানবিক হিতকল্যাণে। বাক্য ও শব্দের নিষ্প্রাণ উত্তরাধিকারে বিশ্বাস নেই কবির, যেকারণে সহজে বলতে পেরেছেন, 'প্রাজ্ঞ পুরুষেরা! তোমাদের বাক্যগুলি এখন ঐরকম / যেন নিস্তেজ প্রদীপের গোড়ায় / দশমী শেষের মহিলা, প্রার্থনাস্তব্ধ, ম্রিয়মাণ শূন্য পীঠে / সাড়ে নয়শত বছরের হেদায়েত: শব্দ ছাড়া বক্তব্য, বক্তব্য ছাড়া শব্দ।'

আরেফিনের কবিতায় শ্লেষ ও বিদ্রূপ খুব মোলায়েম ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'মহিলারা, শিশিরে ভেজা-পাতা হেন মহিলারা তোমাদের / ভালবাসার সোনার কলস কোথায়?' অথবা, 'পঙ্গপাল বিস্তারিত আকাশ বঁড়শি দিয়ে / ঝুলিয়ে রাখে মেঘের টুকরো / বৃষ্টিতে বৃদ্ধি জনপদের মাথায়, বৃষ্টি হয় না কলসে।' আপাত নিরীহ কৌতুকের আড়ালে থেকে শাণিত তূণ নিক্ষেপ করেছেন কবি: 'তবু জন্মের পর থেকে উদ্বেলিত অপেক্ষায় তার / হাঁটুগড় করে প্রার্থনাগুলি / সাদা, কানাবক ধায় একপায় / সারাদিন অচলায়তন, / সে শুধু অপেক্ষাই করে— / ঈশ্বরের রাজ্য মৎস্যন্যায়, রাজত্বে অরাজক / মহারাজন্যসভার স্মরণে।'

শব্দব্যাপারে আরেফিন খুবই সতর্ক; খুব বেশি প্রচলিত ও চলতি শব্দ ব্যবহারে অনীহা। উপমায় নিজস্ব অনুভূতিনির্ভরতা, বৈচিত্র্য সেইসঙ্গে বিশিষ্টতা এনেছে। শব্দ নিয়ে যেমন বেপরোয়া পরীক্ষা, তেমনি ঐতিহ্য অনুসারী প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণুদের তৎসম শব্দের প্রয়োগকুশলতা, সেইসঙ্গে জীবনানন্দীয় পরাবাস্তবের রহস্যময়তা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। এটা ঠিকই, শব্দই কবির একমাত্র অস্ত্র, কিন্তু অন্তর্চালনায় নৈপুণ্য প্রার্থিত হলেও কাব্যগুণ বিসর্জন দেওয়া যায় না। আরেফিন নির্বিচারে বিদেশী শব্দের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার ফলে ডিকশনে চমক আনলেও, শব্দের স্পর্শকাতরতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। 'সেঞ্চুরিয়ান', 'পাটবোর্ড', 'জেটিত্যাগী' ইত্যাদির সঙ্গে 'অনাকাগ্রতা', 'লুক্কায়িত', 'হুড়োহুড়ি', 'খোদ্দের', 'ছিছ' শব্দগুলির কোনো কাব্যিক মূল্য আছে বলে মনে হয় না। শ্রুতিকটুও লাগে। কিন্তু কবি সামগ্রিকভাবে কবিতায় ভাব ও ছন্দের সাযুজ্যে যোগ্য শব্দের নির্বাচনে ও অন্বয়ে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন অবশ্যই তা পাঠককে কবিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

আবু আতাহার কোলকাতাকে ভালোবাসেন, প্রেমিক যেভাবে প্রেমিকাকে তার দোষ-ত্রুটি সব নিয়ে। ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে 'কোলকাতা'-কে নিয়ে তাঁর একাধিক গল্প এবং উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কবির ভাষায়, 'এই শহরের প্রতি আমার দুর্বলতা বাল্যকাল থেকে। বাবার হাত ধরে আমি প্রথম কোলকাতা চিনেছি, তিনি একে-একে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এর যাবতীয় পথঘাট, পার্ক ও দর্শনীয়গুলোর সঙ্গে। তখন থেকেই এর প্রতি আমার দারুণ আকর্ষণ।'

পাঠকেরও তিলমাত্র সংশয় থাকে না। নামকরণ থেকে শুরু করে অন্তর্গত আটত্রিশটি কবিতার মধ্যে মুখের স্বাদ পালটাতে অন্ধধরনের কয়েকটি বাদ দিলে বেশিরভাগ কবিতাই তাঁর প্রিয়তম শহরের প্রতি প্রেমনিবেদনে রচিত। যে শহরের পথে-পথে আনন্দে, বিষাদে, কখনো বিরাগে তিনি নিজেকে ক্রমে-ক্রমে মিশিয়ে ফেলেছেন, স্বাভাবিক কারণে এক ধরনের 'ডিভোশন' গড়ে উঠেছে। ফলত স্থানিক মাহাত্ম্য ও প্রেম কবিতাগুলির মধ্যে এনেছে আবেগ, পিছু ফিরে দেখার অন্ধ টান। সবল আন্তরিক উচ্চারণ সেকারণে: 'কোলকাতা কখনো তোমাকে মা বলি / কিন্তু মায়ের জন্য যে ভক্তিশ্রদ্ধা / যে ভালোবাসা যে মমত্ব / তার কিছুই থাকে না।' অথবা 'গ্রামগঞ্জ থেকে রোজ আসে অগুন্তি মানুষ / পিঁপড়ের সারির মতো শহরতলির লোক / তোমার পথ চেয়ে দপ্তরে ঢোকে / নড়বড়ে বাসে, ধড়ধড়ে ট্রামে.....' [কোলকাতার কাপুরুষ]।

কবির আবেগ, প্রিয় শহরের জন্য আন্তরিক টানকে শ্রদ্ধা জানিয়েও উদ্ধৃত পঙক্তিগুলিকে কবিতা বলতে অস্বস্তি হচ্ছে। অথচ এই শহরের জন্য কবির অনুভব বিন্দু-বিন্দু ক্ষরণ আমাদেরও উদ্বেল করে, কখনো বেদনা আনে। কলকাতাকে 'কোলকাতা' করার মধ্যেই তো সেই আত্মীয়তা, যা ব্যাকরণের ঊর্ধ্বে উঠে পুজোয়, বড়দিনে, ঈদের পরবে, পাতাল রেলে, মুক্তমেলায়, কফি হাউসে, বইমেলায়, ভিড়ে, দারিদ্র্যে, সমৃদ্ধিতে, মাদার টেরিজার সেবায় আমাদেরও ম্যাগনেটের মতো টানে, ফসলে নিয়ে যায়। এক ধরনের নস্টালজিক বোধে ও মায়ায় হৃদয়ে আপ্লুত হই। কোলকাতা প্রিয় কোলকাতা ভাবগত আফরিক যে কোনো অর্থেই সত্যি হয়ে ওঠে।

'যন্ত্রণার পুঁজি কবিতার অস্ত্র' নামের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ-সঙ্কলনের ভূমিকা থেকে জানা যায় কলকাতার মতো মেদিনীপুরেও নাকি 'বুধসন্ধ্যা'র আসর বসে যেখানে প্রতি সদস্যকেই নিজের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে হাজির হতে হয়। সাহিত্যের আড্ডা থেকে পরবর্তী কালের মহৎসৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে এমন প্রমাণ সুদুর্লভ নয়। বলাবাহুল্য এইরকম সভায় পঠিত কবিতা বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ নিয়ে কবি বিপ্লব মাজী তাঁর প্রবন্ধ-সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। প্রায় সব প্রবন্ধেই মাটি ও মানুষ থেকে কবিতার ও কবির জন্ম, সৃজনশীল আন্দোলনেই কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো ছাড়া যে কবিতার মুক্তি নেই, কবিতা যে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যান নয়, পণ্য নয়—ইত্যাদি বিষয়ে কবি তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থিত করতে পেরেছেন। কোথাও অস্পষ্টতা নেই, ভাবের কুয়াশা নেই কিন্তু যুক্ততর্ক মেনে নিয়েও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, সাহিত্য সম্পর্কে শেষ কথা কি বলা হয়ে গেছে? বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেশে-দেশে সাহিত্যের যে বিচিত্র প্রকাশ ও আন্দোলন লক্ষ করা যায় তা কি সেই দেশের সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নি? প্রাবন্ধিক লিখেছেন, 'কবি যদি মহৎ হন, তিনি যদি জনগণের মধ্য থেকে নিজের সৃজনশীল কর্মের জোনাকি পোকা তুলে আনতে চান, নির্জনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁকে মিশে যেতে হবে জনতার

মধ্যে। কারণ জনগণের মধ্যেই একজন সৃজনশীল শিল্পী খুঁজে পান নিজের সৃষ্টিকে নতুন করে শানিয়ে নেবার আগুন বা অনুপ্রেরণা। মানুষ ও মাটি থেকে একজন কবির জন্ম এবং মানুষ ও মাটির সংযোগসূত্র-হীন রচনা কালোত্তীর্ণ হয় না এবং অল্পায়ু হয়ে থাকে, একথা মেনে নিয়েও কি বলা যায় না যে লেখক বা কবি শুধুমাত্র মাটিতেই পা রেখে হাঁটেন অথচ যাঁর হাত আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করল না বা পারল না, তাঁর সৃষ্টিতে যতই রক্ত থাকুক না কেন, আকাশের বিশালতা ও ব্যাপ্তির অভাবে তা দেশ ও কালের সীমা-রেখা অতিক্রম করতে পারে না। দেশে দেশে কালে মানুষের বিচিত্র মত ও আদর্শের যে প্রকাশ প্রতিভার স্বর্ণ-স্পর্শে তা-ই সভ্যতার কল্যাণকামী চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বোধ হয় সৃষ্টির বীজেই সেই বৈচিত্র্যময়তা, যা তাকে সমান্তরাল রেখার মধ্যে বাঁধতে পারে না।

একথা ঠিকই, কবিতা পণ্য নয়। কবি ক্রীতদাস হতে পারে না। কণ্ঠে বকলসের দাগ 'মনোপলি ব্যবস্থায়' বা 'সামন্ততান্ত্রিক যুগে' শ্রদ্ধেয় হলেও, নিশ্চয়ই এখন তা হতে পারে না। উৎপাদনমুখী বর্তমান বিশ্বে তীব্র প্রতিযোগিতা যখন, কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার একচেটিয়া অবস্থান গ্রাহ্য হতে পারে না। একসময়ে কোনো বিশেষ উৎপাদকের নামাঙ্কিত থাকলেই উৎপাদিত দ্রব্য সহজে বিক্রি হয়ে যেত, এখন তা হয় না। বিশ্বের বাজারে উন্নতমান দ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় ক্রেতা নিছক 'নামে' সন্তুষ্ট নয়, 'মান' চায়। সাহিত্যের ব্যাপারেও কথাটা প্রযোজ্য। 'কবিতা কেন মুষ্টিমেয় একদল মানুষের দাসত্ব করে যাবে', কিংবা 'ইউরোপীয় কবিতার আন্দোলনগুলি আমাদের উত্তরাধিকার না, তা শুধু মানুষের কাছ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে এক হতাশা শূন্যতা ও নির্বেদের জগতে নিয়ে যায়,' এইসব বিতর্কিত প্রশ্ন পাঠককে চিন্তান্বিত করে তোলে। শিল্পদ্রব্যের মতো সাহিত্যেও 'মনোপলি' চলে না। কিন্তু চলছে, খোলা চোখে দেখা যায় পুঁজিবাদী সংস্থায় কর্মরত লেখকদের চাকরি, সম্মান, পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হায়, কালের বিচারে সেইসব লেখা কতদূর যাবে? মাত্র কয়েকজনকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেতার, দূরদর্শন বা বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় প্রচার করে হয়তো সাময়িক ফল পাওয়া যায় কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কালোত্তীর্ণ হয় না। নতুন-নতুন প্রতিভার উন্মেষে ও অবদানে শিল্প-সাহিত্য সজীব হয়ে ওঠে, এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ইউরোপীয় যাবতীয় আন্দোলন কি হতাশার দিকে টানে, বিচ্ছিন্নতা আনে! বোধ করি অতিসরলীকরণে বা আবেগে এর সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। ইউরোপীয় রেনেসাঁস নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে পালাবদল ঘটিয়েছে, বিপ্লব এনেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনের প্রভাবে বহির্জগতের বিপ্লবের সঙ্গে অন্তর্জগতের বিপ্লব না হওয়ায় কোথাও কোথাও হতাশা, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। বোধকরি, লেখক ঠিকই বলেছেন, 'বুদ্ধিদীপ্ত আলো আমাদের যেমন চাই, চাই আবেগ ও অনুভূতির সমুদ্রগামী সঞ্চার। সেই অভীষ্ট পথে জন-গণের মধ্যে থেকেও তো কবি নির্জনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচনা করতে পারেন শতাব্দীর গভীর কবিতা।'

আলোচ্য গ্রন্থটি বক্তব্যের ঋজুতায়, ভাষার প্রসাদ-গুণে যে কোনো পাঠকের মনোযোগ দাবি করে।

এমন কিছু মহৎ বিষয় থাকে যার সম্পর্কে অজস্র লেখালেখির পরেও অজস্র লেখালেখির অবকাশ থেকে যায়। যা কোনোদিন পুরনো হয় না, লেখকরা ক্লান্ত হন না যাঁকে নিয়ে লিখতে। ক্যালিডোস্কোপে মুহূর্তে মুহূর্তে যেমন নতুন নকশা তৈরি হয়, সেইসব মহৎ বিষয়বস্তু নিয়েও সংবেদনশীল ও সংক্রামিত কবি-চিত্ত নানান ছবি তৈরি করে নিতে পারে। বস্তুত বিরাটত্বের রহস্য সেইখানে, যার বিপুল সৌন্দর্য নানা বর্ণের আলো নিক্ষেপ করে। নানান রূপকল্প

নানান প্রতিমা গড়ে ওঠে।

এমনি এক বিষয় 'সমুদ্র'। আদিকাল থেকে আজও মানুষ সমুদ্র-দর্শনে উতলা হয়, মুগ্ধ হয়, সমুদ্রের বিশাল আয়নায় নানাভাবে নিজেকে দেখতে চায়। যে দেখার শেষ নেই, অফুরান যার ভাণ্ডার।

কবি বিপ্লব মাজী সমুদ্রকে কেন্দ্র করে পঁয়ষট্টিটি কবিতা লিখেছেন, যার বেশির ভাগই খুব ছোট কবিতা বা কবিতিকা। সমুদ্র ও সৈকতের নানান চিত্র উঠে এসেছে সেইসব কবিতায়। ছোট ছোট শব্দে ও পঙক্তিতে সমুদ্রের যে ফ্রেসকো রচনা করা হয়েছে তার কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল। 'সমুদ্রের / সবুজ নীল জানলা / খুলে গেল / আমরা / দেখলাম / ভেতরে আরো / অনেক জানলা, যেখানে উড়ছে / গাংচিল।' শুধু চিত্র নয়, চিত্রের ভিতরে অন্বেষণও আছে। 'বেলাভূমির ওপর / রোদে শুকোচ্ছে / তিন টুকরো কাঠ / মুলিয়াদের আত্মার / তিন টুকরো / যা জুড়ে / তারা মাছ ধরতে যায় / গভীর সমুদ্রের দিকে।' সমুদ্রকে নিয়ে কবির কল্পনা দূর-প্রসারী। 'সমুদ্র নেয় না কারো কিছু·· ফিরিয়ে দেয় সব / সে নির্লোভ মুক্তপুরুষ, আলোর অধীশ্বর / সেই কবে থেকে / গড়ে চলেছে নির্বাণের পথ / যা চেয়েছিলেন একদা অবলোকিতেশ্বর।'

কিংবা, 'নীরব পদ্ম তাঁর নাভিগর্ভ থেকে / উঠে গেছে নিজস্বসুরে আকাশের দিকে।' কবির নিজস্ব প্রচ্ছদ গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তি-সংগ্রামকে দমন করার জন্য দখলদার ঔপনিবেশিক শক্তির অমানবিক ও পাশব নির্যাতন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী মানবাত্মার স্বপ্ন ও যন্ত্রণা নিয়ে 'উষ্ণমণ্ডলের রাত'-এর কবিতাগুলি রচনা করেছেন কবি বিপ্লব মাজী। অন্তর্ভুক্ত ২৮টি কবিতার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মারিয়া হেইলার ও দেবেন দাশ স্মরণে কবিতা যেমন আছে, বেইরুটের ওপর ইস্রায়েলি ও মার্কিন তাণ্ডবনৃত্য, বিহারের পিপরায় আশির দশকেও হরিজনদের ওপর দলবদ্ধ অত্যাচার ও হত্যা নিয়েও কবিতা রয়েছে। যেখানে মানবাত্মার ওপর অত্যাচার সেখানেই কবিতার হাত প্রতিবাদে মুষ্টিবদ্ধ। প্রকৃত-পক্ষে এই সঙ্কলনটি একটি প্রতিবাদী কবিতার বই।

১৯৭২ সালে ষোলোই ডিসেম্বর মোজাম্বিকের উইরিআমু শহরে ঔপনিবেশিক পর্তুগীজ শক্তির নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কবি নিজেকে শরিক করে তুলেছেন নির্যাতিত মানুষদের। 'হতেও তো পারতাম / মুয়াজ তাওয়া-তাওয়া নদীর বুকে / ভেসে যাওয়া নক্ষত্রের লাশ / হতেও তো পারতাম / ফ্যাশিস্ত পশুর বুটের তলার ঘাস।'

কখনো ফাঁসির দড়ির দিকে দীর্ঘপায়ে এগিয়ে যাওয়া কোনো মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। সলোমন মালাঙ্গু সেই চেতনার নাম, যাকে উদ্দেশ করে কবি বলেন, 'তোমার স্থান জনগণের হৃদয়ের / দোলনায় দোলনায় দোলনায় / ঘরে ঘরে আফ্রিকার / আফ্রিকা দাঁড়াচ্ছে।/ সলোমন, তোমার আফ্রিকা।'

স্বাধীন স্বদেশে ধর্ষিতা হরিজন কিশোরীর ভেসে যাওয়া লাশ প্রতিবাদে যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে : 'আকাশে কাকজ্যোৎস্না চাঁদ / আকাশে উড়ছে দাঁড়কাক / নিচে ঘোলাজলে / ঘোলাটে চাঁদ ও দাঁড়কাক / আর ঐ ভেসে যাওয়া কিশোরীর লাশ / স্রোতের বলাৎকারে ভুলে যায় অন্য এক বলাৎকারের / তিক্তস্বাদ।'

ক্লীব সময়ের গভীর অন্ধকারেও হারিয়ে যায় না উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর। কবির বিশ্বাস, 'এই অন্ধকারে / মানুষের ডানার আগুন / সযত্নে লুকানো আছে / এই অন্ধকার / এই মানুষদের নিয়েই / এই দেশ / এই জনগণ—/ আজ ফিনিকস পাখি।'

পেপারব্যাকে এই ধরনের বেশ কয়েকটি তাজা কবিতার সঙ্গে ভালো লাগল "লোকেরা" কবিতাটি।

'লোকেরা আসে / কথা বলে, হাসে গায়, তারপর / অ্যাশট্রে ভর্তি সিগারেট / ঝুড়ি ভর্তি কমলালেবু ডিম ফেলে রেখে / রাজহংসীদের কাঁধে হাত / যে-যার সে তার গোপন উল বুনতে বুনতে / অন্ধকারের দিকে চলে যায়···।'

ছ'জন নোবেল পুরস্কার জয়ী কবিকে দুই মলাটের মধ্যে হাজির করা নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। ভাষান্তরণ ও কাব্যরূপ দিয়েছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও বিপ্লব মাজী। শেষোক্ত কবির সম্পাদিত এই "গোলাপেরা শিশির চুম্বিত' অনুবাদগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে 'তিনজন আধুনিক বাঙালি কবি এই শতাব্দীর ছ'জন বিশিষ্ট কবির সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছেন,···অনুবাদগুলি পড়ে দেখলাম বেশ কয়েকটি অনুবাদে মধুর স্বাদ পাওয়া না গেলেও টাটকা খেজুর রসের প্রাণ ও স্বাদ আছে।'

বলাবাহুল্য যে কোনো অনুবাদ যতই মূলানুগ হওয়ার চেষ্টা করুক, মূলের সম্পূর্ণ স্বাদ দিতে পারে না। অনুবাদ প্রতিবিম্ব হয় না, হওয়াও অভিপ্রেত নয়। দেশ, কাল ও সময়ের ব্যবধান। এক ভাষার শব্দের মাধুর্য ও ব্যঞ্জনা ঠিক অপর ভাষার প্রতিশব্দের মধ্যে আশা করা যায় না। এক ভাষায় প্রচলিত উপমা, দেশাচার, চিত্রকল্প ইত্যাদি কীভাবে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের আরেক ভাষায় অনুবাদ করা যায়? ভাষাগুলির প্রতিবেশী-সুলভ সম্পর্ক ও আদান-প্রদান থাকলে হয়তো কিছুটা সম্ভব; আবার অনুবাদ সরাসরি না হয়ে তৃতীয় কোনো ভাষার মাধ্যমে হলে স্বাভাবিক ভাবে মূলের প্রাণ ও স্বাদ লাভ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মোটামুটি ভাবে তিনজন অনুবাদক মূলের প্রতি কতটা আনুগত্য বজায় রাখতে পেরেছেন না জানলেও বলা যায় অনূদিত কবিতাগুলি পাঠ করে ভিনদেশী ফুলের গন্ধ টের পাওয়া যায়।

১৯৪৫ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত দক্ষিণ আমেরিকার মহিলা কবি গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের লিরিকধর্মী কবিতার অনুবাদে নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ভিনদেশীয় পরিবেশকে স্বদেশীয় করে তুলেছেন। 'কেমন দেখতে হবে তাকে' শীর্ষক কবিতায়, 'তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ গোলাপের পাপড়ির দিকে। / যুগ্ম আমি স্পর্শ করলাম সেই পাপড়ি / হয়তো এরকমই নরম হবে আমার সন্তানের গাল দুটি / বৈচিত্র্যোপের আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম / এই আঁধারের মতো কালো আর ঘন হোক তার চুল।' ডাক্তার ঝিভাগো খ্যাত বিতর্কিত বরিস পাস্তেরনাকের কবিতার অনুবাদ করেছেন বিপ্লব মাজী। 'শীতের রাত' কবিতা অনুভূতির তীব্রতা এইভাবে ফুটে উঠেছে: 'তুষার, তুষার সর্বত্র ছড়ানো, তুষার / পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তরে।/ টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলে যাচ্ছে / নিঃসঙ্গ একা, মোমবাতিটা জ্বলে যাচ্ছে···।' 'স্বপ্ন' কবিতায়, 'বিদায় নিচ্ছে সময়, বার্ধক্য এবার; যেন ভদ্দুর পাতলা বরফ/ হাতলওলা চেয়ার—রং চোটে যার সিল্ক উঠে যাওয়া;/ লাস্যময়ী তুমিও হঠাৎ শান্ত—বড় একা; / প্রতিধ্বনি ঘণ্টার—স্বপ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়।' লক্ষণীয় কবিতার পরিবেশ ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে কৃত্রিম হয় নি বরং প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

সালভাতোর কোয়াসিমোদোর কবিতা পাঠের পূর্বাহ্নে যে একটি বিশেষ প্রস্তুতি প্রয়োজন, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অনুবাদক। ব্যবহৃত শব্দের অর্থের গভীরতা ও সার্বজনীনতা সত্ত্বেও বহুমাত্রিক তল কবিতায় কখনো অস্বচ্ছতা এনেছে, ভুল করে যাকে দুর্বোধ্যতা বলতে পারে পাঠক। এই কবির কবিতায় নৈতিক মূল্যবোধের হ্রাস, মানবিক স্খলন সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যমুখীনতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সময় কোয়াসিমোদো সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'আমাদের কালের জীবনের বিয়োগান্তক অভিজ্ঞতাকে ধ্রুপদী আগুনের দীপ্তিতে প্রকাশ করেছে।' 'কোন এক মানবিক মুহূর্তে' শীর্ষক কবিতায় 'সৌন্দর্য আমাদের প্রতারিত করে, / যে কোন আকৃতিও স্মৃতি বিলীন হয়ে যায়। / অনুভূতির কাছে ভেসে যাওয়া আবেগ অনাবৃত / প্রতিবিম্বিত করে অন্তর্মুখী আংনা। অন্তর্মুখী আগুনেই কোয়াসিমোদোর কবিতা জ্বলন্ত নক্ষত্রবিশেষ।

গ্রীক কবি জর্জ সেফেরিস নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৩ সালে। কর্মসূত্রে প্যারিসে অবস্থানকালে প্রতীকীবাদী নতুন সাহিত্যরীতির আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন। এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমার দ্বারা প্রভাবিত হলেও মাতৃভূমির সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, ইতিহাস উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়, প্রগতিবাদী সভ্যতায় মানুষের ভূমিকা নিয়ে ভাবিত সেফেরিস বলেছেন, 'ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এই পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন অন্যদেরও। তাই যেখানেই থাকি মানুষকেই খুঁজে নিতে হবে আমাদের।' সেফেরিসের কবিতার চাবিকাঠি সেই রহস্যময়তা যা ঘিরে থাকে প্রাচীনকে, পুরাণকে, স্মৃতিময় শহর ও বন্দরকে।—'রাতের এই তারারা আমাকে ফিরিয়ে দেয় সেই প্রত্যাশা / মন্দারপুষ্পবনে মৃতদের জন্যে যা ছিল ওডিসিয়াসের / মন্দারপুষ্পবনে যখন নোঙর ফেলেছিলাম আমরা দেখতে চেয়েছিলাম / সেই পর্বতের শিখর যেখানে পৌঁছতে আডোনিস / পেয়েছিলেন যন্ত্রণা।'

জন্মসূত্রে ইস্রায়েলী মহিলা কবি নেলী শাখস্ আর এক ইস্রায়েলী কবি এম. ওয়াই ত্যাগননের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৬৬ সালে। সারাটা জীবন প্রায় দুর্ভাগ্য তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। ইস্রায়েলী হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্যাতিতা হয়েছিলেন জার্মানদের হাতে। মায়ের সঙ্গে শ্রমিক ক্যাম্পে যাওয়ার থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পান। আবাল্য বিরূপ পরিবেশে নিষ্ঠুর রাষ্ট্রযন্ত্রের শিকার হওয়ার ফলেই শেষ হয় নেলী শাখসের কবিতায় আত্মমগ্নতা; রহস্যমেদুর এক অলৌকিকতা লক্ষ্য করা যায়। 'যে তুমি ভালোবাসো / যে তুমি আকাঙ্ক্ষায় চুর হও, / শোনো, যে তুমি কাতর হও বিচ্ছেদে: / আমরা তারাই যারা বাস করি তোমার চাউনির ভেতর / তোমার হাতের মধ্যে যা খুঁজছে নীল বাতাস— / আমরা তারাই যারা সকালের গন্ধ পাই।' তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবলীল অনুবাদে নেলী শাখসের 'মানবিক উচ্চারণ' মূর্ত হয়ে উঠেছে কয়েকটি নির্বাচিত কবিতায়।

পোল্যাণ্ডের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবি চেস্‌লাভ মিলোজ সোজাসুজি তাঁর বক্তব্য কবিতায় পেশ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'কাকেই বা বলে কবিতা, যদি না তা রক্ষা করে দেশ বা মানুষকে।' পোল সাহিত্যের একজন সমাজসচেতন কবি মিলোজ 'ফাস্ট ভ্যানগার্ড' ও 'সেকেণ্ড ভ্যানগার্ড' আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করেই কবিতা লিখতে হবে। একটি অসাধারণ কবিতা, 'পৃথিবীর সেই শেষ দিনটিতে' মিলোজ লিখেছেন, 'আর যারা আশা করেছিলো বজ্র ও বিদ্যুত / তারা হতাশ হয় / আর যারা আশা করেছিলো লক্ষণসমূহ ও দেবদূতের বাজনার স্বর / তারা বিশ্বাস করে না এখন এটা ঘটছে / যতোক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ ও সূর্য মাথার ওপরে আছে / যতোক্ষণ পর্যন্ত মৌমাছি ঘুরছে গোলাপের কাছে / যতোক্ষণ পর্যন্ত গোলাপী শিশুরা জন্মাচ্ছে / ততোক্ষণ কেউ বিশ্বাস করে না এখন এটা ঘটছে।'

নির্বাচিত ছ'জন কবির কবিতার অনুবাদে এমন একটা সহজ ভঙ্গী আছে যা পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া কবিদের সম্পর্কে তথ্যাদি কবিতাগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে।

এই সময়ের অন্যতম পুরোধা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কীয় ব্যক্তিগত মতামত ইদানীং 'খবর' হয়ে উঠেছে। সেইসব মতামত বিতর্কিত হওয়ার কারণে পক্ষে বিপক্ষে নানান কথা শোনা যায়, এমনকী তাঁর কবিতার ব্যাপারেও। আগাপাশতলা নির্ভেজাল কবি

শক্তির শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন না, একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল এই, একটি বিশেষভাবে সমাদৃত ও পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থের পর থেকে তাঁর কবিতা কেমন যেন একই রুটে যাতায়াত করছে। নতুন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে যায়। এর মানে এই নয় যে নতুন কবিতা তিনি লিখছেন না। নিশ্চয়ই লিখছেন এবং ভালোমতোই। 'বিষের মধ্যে সমস্ত শোক' কাব্যগ্রন্থটির শিরোনামের কবিতাটির কথা ধরা যাক, দীর্ঘ এই কবিতাটিতে ভাবোচ্ছ্বাস-জনিত পুনরুক্তি-দোষ, যথা একই শব্দ, শব্দবন্ধ, পঙক্তি ঘুরে ফিরে এসেছে। এই নিজস্ব কৌশল পাঠকের কখনো ভালো লাগলেও, একঘেয়েমিতে প্রায়ই ক্লান্ত করে। 'মদ খেয়েছি, এমন তাতে ছিলো তেমন ময়ূরবাহন / মদ খেয়েছি ছেলেবেলায় / দুর্গা-নামও দেখেছি ঠিক / মদ খেয়েছি ময়ূরবাহন / কিন্তু সে তো একলা আমার / আমার ভিতর সেই ছেলেটির মধ্যে ছিল ময়ূরবাহন / এক বাটি মদ, সঙ্গে সঙ্গে এক বাটি মদ সঙ্গে সঙ্গে / খেয়ে, একটু ভিরমি খেয়ে দেখে-ছিলাম ময়ূরবাহন / ' অথচ এই কবিতাতেই এমন শব্দের বিহার আছে যা ময়ূরবাহন না হয়েও অনুভূতির তীব্র স্বাদে ঠোঁটের কাছে এনে দেয় 'এক বাটি মদ', যা মুহূর্তে চুমুকে শেষ করা অপান রসিকের কাছেও অস্বাভাবিক হয় না।

অবশ্য দীর্ঘ কবিতার যা দোষ তা এই কবিতাতেও আছে। দীর্ঘ বিস্তার কবিতায় ভারসাম্য রাখতে দেয় না। কখনো তা স্বেচ্ছাকৃত মনে হয়। কারণ এইরকম দীর্ঘ কবিতায় কবি একস্‌পেরিমেন্টের লোভ সামলাতে পারে না, আঙ্গিক ও প্রকরণের বিবিধ কৌশল, অনেক মাছ খেলিয়ে তোলার মতো ব্যবহার করে। আসলে দীর্ঘ কবিতায় চেতনাপ্রবাহ অখণ্ড থাকে না, ভাঙচুর হয় এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নানান স্রোতের সৃষ্টি হয়। আর একটি মাঝারি মাপের কবিতায়, 'তুমি আছো ভিতের উপরে আছে দেয়াল, খরশান অনুভূতি বিকৃত হয়েও সংহত। মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা—/ জন্ম আগে মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ, / পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের / সেখানে মাইল পোস্ট নেই—নেই টেলিগ্রাফ তার / মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ—/ পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের।' চমৎকার শাব্দিক সাযুজ্য ছাড়াও ভাবগত সংহতি কবিতাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গীতে লেখা বেশ কয়েকটি কবিতা এই সংকলনে আছে। এইসব কবিতায় চুম্বক থাকলেও মূল্যমানে কতদূর যেতে পারবে বলা শক্ত। 'এবং বাগান দেখো অতঃপর / ঘরের পাশে পুরনো ডাকঘর। / অমল, কেন হারিয়ে গেলে তুমি ? / বাগান তার স্মারক, মনোভূমি।'

শব্দের ব্যবহারে সিদ্ধপুরুষ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই তাঁর নিজস্ব কিছু শব্দকাহিনীকে কাজে লাগান। এই বইয়েতেও 'ঘষটানি', 'কানি', 'থিম-চোয়', 'থোঁচকা বলা', 'মানচিত্তির', 'রেলা', 'মিছু' ইত্যাদি কবির যতই প্রিয় হোক্ না কেন, পাঠকের প্রতিক্রিয়া সর্বদা সুখকর নয়। শ্রুতিমাধুর্যেরও তো কিছু দাবী থাকতে পারে।

শক্তির কবিতায় মৃত্যুচেতনা, জীবনানন্দ, চাপা-কৌতুক ও রোমান্টিকতা সহজেই ধরা পড়ে। হাল্‌কা শ্লেষ, যেমন, 'সন্ধ্যার মতন বক তীর অবনত / গঙ্গা-ফড়িং-এর মত স্থানীয় শুদ্ধতা।' কিন্তু শব্দের খেলায় মেতে গিয়ে কবি ভুলে যান খেলার মজায় কবিতা কিন্তু হাল্‌কা হয়ে যায়, 'তোমার কেমন লাগে চাঁদ ? / জঙ্গলের অন্তর্গত ফাঁদ— / কী লাগে, কেমন করে লাগে / এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো / এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো ! / তোমার কেমন লাগে চাঁদ ?'

মোট ৩৩টি কবিতা নিয়ে এই কবিতার বইটি তার প্রচ্ছদে, কাগজে, মুদ্রণে আভিজাত্য বজায় রেখেছে।

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে পড়ার সুযোগ পেলেও কাব্যাকারে এই প্রথম পেলাম। এই

বইয়ে শিরোনামের কবিতাটি ছাড়াও আরো ২৪টি কবিতা স্থান পেয়েছে। দুই পঙ্‌ক্তির 'সময়' যেমন আছে, ৪৩ পঙ্‌ক্তির 'অন্য নামের গল্প' তেমন সহাবস্থান করেছে। সার্বিক ভাবে দেবাঞ্জলির কবিতায় নিসর্গের অপার রহস্যময়তা আধেক দৃষ্টিপাতে ইশারা করে। অবশ্যই প্রতীকী অর্থে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, চেতনা-প্রবাহ অবশ্যই সেই খণ্ড-মুহূর্তগুলিকে সঞ্জীব করে তুলেছে। 'আকাশ পাখির মতো নীল ঝাউ আলো পালটে / অন্যজন্ম খুলে দিলে, ভূতগ্রস্ত হেঁটে যাই। / আশ্চর্য অরণ্যমাঝে, অসমান সব পাতা ডালপালা নিয়ে একটি পাগলা বৃক্ষ, / অশরীরী ফুল খসে যায়। / দূর গাছে সাদা জন্মফল, ঠিক প্রতিধ্বনি।' [আবার অন্য জন্মে]

প্রায় কবিতায় জীবনানন্দীয় অলৌকিক প্রতি-ভাস মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'এইসব ঘাসগুলি চুপি চুপি বোবা কথা বলে, / সাদা করবীর ডাল নুয়ে এসে বুঝে নেয় ভাষা।' কিংবা 'ধূসর সমুদ্রবর্ণ সব অদ্ভুত পুতুল ছিল আমার। / দিগন্ত ফেটে মেঘ করে এলে / আমি খেলতে নামতুম। / জেলির মত ফসফরাসের চোখ জ্বলত / সেইসব নিষ্প্রাণ সমুদ্রকণিকাদের।'

নাগরিক সভ্যতার প্রাণহীন অস্তিত্ব, তার শরীর, অথচ তাকে ঘিরে দিনযাপন, মুগ্ধতা তীব্র শ্লেষের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। 'এক্সুনি স্ট্যাণ্ড থেকে উড়ে যাবো / ওহো আমি তো মেহগনি কাঠের পরী। / আমার ডানা মেহগনি গাছের ডাল / আমার চোখ মেহগনির পাতা / আমার সমস্ত শরীর আধ লালচে খয়েরি মেহগনি।' [মেহগনি কাঠের পরী] কবিতাটি ভালো লগ্গে কিন্তু শেষ চার লাইন অতি সরলী-করণের দায়ে অভিযুক্ত হতে পারে।

শ্লেষের পাশাপাশি জীবনের স্বপ্নভঙ্গ এবং প্রগাঢ় বিষাদ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, 'খড়ের বসুধা' নামে কবিতায়; পুরো কবিতাটাই উদ্ধৃত না করে উপায় নেই। 'হলুদ আমের মতো রাত নেই, চাঁদ নেই এই পৃথিবীতে, / কাঁচের চাঁদের গায়ে লেগে আছে পৃথিবীর কাদা। / মৃত্তিকাবর্ণের মাটি হয়ে গেছে ছিচারী আলাদা, / হলুদ আমের মতো রাত নেই, খড়ের বসুধা। / মৃত্যুধান খুঁটে খায় আদিম কুক্কুট হিম-সাদা।'

চিত্রকল্প রচনায় কবির সাফল্য যেখানে, অনর্থক সেখানে কিছু স্মার্ট ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ কেমন যেন বেমানান লাগে, ম্রিয়মান করে চেতনাকে। 'কলিশন', 'অফ হোয়ায়েট পারা', 'রোপওয়ে', 'সুপার গ্যালাকসি', 'ওরিয়ন', 'জিরোপয়েন্ট', 'ফ্রন্টে', 'সাইক্লিক অর্ডার' ইত্যাদির মধ্যে কয়েকটিকে ছাড়পত্র দিতে পারলেও বাকিদের জন্য ঠিক সমর্থন রাখা যায় না।

স্যুররিয়ালিজমের প্রভাব কবিতায় ছড়িয়ে আছে, 'তিনকাল' কবিতায় 'গভীর রাতে নিভিয়ে দিলে আলো / দেয়ালে ছবি সৃষ্টি হতে থাকে— / অশুভ এক দেয়াল বেয়ে মাছ / ছাদের দিকে উঠতে থাকে খালি, / মুণ্ডহীন ছায়াশরীর তার, / জোড়া দু-চোখ লেজের পুচ্ছে / জ্বলছে শুধু জ্বলছে ধ্বক্‌ধ্বক্ / ভৈরবীর রক্ত আচ্ছাদন।' কিংবা, 'রুপোলি ছোট্ট বালাম চালের বাড়ি, / সোনামুগ আর মুসুরের কারুকাজ / দরজা-জানালা সবুজ কপির পাতা। / ঝাড় লণ্ঠন পেঁয়াজ কলির, / আলো তার সাদা আতা।' [শস্যের বাড়ি]

কবিতা-নির্বাচন-কালে 'ভ্রম', 'পোড়া পাখির প্রেম নিবেদন' 'সময়', 'পূর্বাপূর্ব' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা বিযুক্ত হলে ক্ষতি ছিল না।

বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে উন্মেষ প্রকাশনী প্রকাশ করেছে 'কারাগারের কাব্য।' মূল কবি সংগ্রামী রাষ্ট্রনায়ক হো চি মিন। মুনীর সিরাজ ছোট ও মাঝারি মিলিয়ে প্রায় একশো কবিতার অনুবাদ করেছেন। চীনের মহা বিপ্লবী মাও সেতুঙের মতো ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতা হো চি মিন মনে প্রাণে কবি ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক পুরনো ব্যবস্থা, শোষণ,

অপশাসনের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন প্রতিবাদী হয়েই শুধু জীবন কাটাননি, সক্রিয়ভাবে উপনিবেশিক ও ফাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলেন। আর এই কাজে কবিতা ছিল তাঁর অন্যতম হাতিয়ার। দীর্ঘ কারাবাস, নির্যাতন, অসুস্থতা, অনাহার কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁর মানসভূমি ও অবস্থান থেকে একচুল সরে যান নি। স্বভূমিতে দাঁড়িয়ে যেমন বীরযোদ্ধার মতো লড়াই করেছেন তেমনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন হৃদয়কে। যে হৃদয় নির্যাতিত মানবাত্মার দুঃখে দুঃখী, আনন্দে আনন্দিত। আলোচ্য কবিতাগুলি চীনের কোয়াংসি প্রদেশের ১৮টি জেলখানায় থাকাকালীন রচিত হয়েছিল। এই কবিতাগুলির অনুবাদ 'কারাগারের কাব্য' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদক হিসেবে মুনীর সিরাজ কতোটা সফল হয়েছেন মূল জানা না থাকায় বলা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু অনূদিত অবস্থায় কবিতার শব্দময় শরীর থেকে যে বেদনা ও যন্ত্রণা বিচ্ছুরিত, তাতে অনুবাদকে অকৃত্রিম মনে হওয়া স্বাভাবিক।

জেলের ভিতর বন্দী থাকাকালীন কয়েদীদের সঙ্গে তাঁর জীবন-যাত্রা, নানান ঘটনা যেমন আছে, তেমনি পাওয়া যায় জেলখানার বাইরে মুক্ত প্রকৃতি ও জীবনের জন্য আকুলতা। অনুবাদক যথার্থই লিখেছেন, 'প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে হো চি মিনের কবিতায়। আকাশ, চাঁদ, পাহাড়, নদী, বৃষ্টি, ভোর, শরৎ, হেমন্ত, ধানক্ষেত, গ্রাম এবং প্রান্তর প্রায় সব ধরনের প্রাকৃতিক দৃশ্যই চিত্রায়িত করেছেন তিনি। মাটির সাথে তাঁর বন্ধন ছিল নিবিড়। তাই কারাগারের কঠিন বন্ধনে থেকেও তিনি ভুলতে পারেন নি কবিতাকে, ভুলতে পারেন নি প্রকৃতিকে।'

'ডাইরীর প্রথম পাতা' নামের কবিতায় তিনি বলেছেন, 'কবিতা পাঠ আমার অভ্যাসের একটি নয় / কিন্তু এ বন্দীশালায় কি আছে অন্য কাজ ? / কয়েদী এ দিনগুলো কাটাবো কবিতা লিখে / আর ত। গাইতে গাইতেই নিকটে আনবো। স্বাধীনতার দিন।'

লোহার পদবেড়ি, জেলের খোরাকি এক বাটি লাল ভাত, পানির রেশন, জুয়োখেলা, খাবার হিসেবে কোথাও কুকুরের মাংস, মলকুণ্ডের পাশে অবস্থান এইসব নৃশংস অমানবিক পরিবেশ হো চি মিনকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত করতে পারে নি। শুনেছেন বাঁশির শব্দ যা চোখের সামনে টেনে এনেছে, 'যেন সহস্র মাইল দীর্ঘ নদী এবং পর্বতের পথে / ঘুরে ফেরে একটি তীব্র বেদনা।' জেলখানার ভেতরে যেন ঢুকে পড়েছে 'ধান ভানার শব্দ' যা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে, 'ধান আর কত সইবে অবিশ্রাম মুষলের ঘা। / কিন্তু এ নিষ্পেষণ শেষ হলেই বের হয় / তুলোশুভ্র চাল / এমনই ঘটনা ঘটে প্রায়শই মানুষের / জীবনে। সন্ধ্যার দৃশ্য' কবিতায় একজন প্রকৃত কবির সাক্ষাত পাওয়া যায়। 'সন্ধ্যার গোলাপ ফোটে তারপর মিলায় নিঃশেষে / ফোটা আর ঝরে পড়া সমস্তই অদৃশ্যে ঘটে যায় / জীবনের দুঃখ আর অবিচার স্মরণ করিয়ে / জেলের ভেতর তবু ভেসে আসে গোলাপের মধুর সৌরভ।'

নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের এছাড়া আর কীভাবে মিশ্রণ হতে পারে ? পেপারব্যাকে সুমুদ্রিত শোভন প্রচ্ছদের এই অনুবাদকর্মটি নিশ্চয়ই পাঠকদের ভালো লাগবে।

জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কিত নিবন্ধটির লেখক অমলেন্দু সেনগুপ্ত। সূচীপত্রে তাঁর পদবীটি 'দাশগুপ্ত' ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা লজ্জিত। —সম্পাদক

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

অ. কৃ. ব ও জাদু-সাহিত্য

দিগম্বর দাশগুপ্ত

অনন্য সাহিত্যিক অ. কৃ. ব (অজিতকৃষ্ণ বসু)-র ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত মাসিক "আভা" পত্রিকার অ. কৃ. ব সংখ্যায় সম্প্রতি প্রয়াত প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'অ. কৃ. ব' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন :

'অ. কৃ. ব-র রচনার পরিমাণ স্বল্প হলেও বৈচিত্র্যে তা বিস্ময়কর। তিনি জাদুবিদ্যা সম্বন্ধে যা-যা লিখেছেন, তাতে তাঁকে জাদু-সাহিত্যের স্রষ্টাই বলা চলে।'

ভারতে জাদু-সাহিত্যের সর্বপ্রথম গ্রন্থ "জাদু-কাহিনী" (প্রকাশ-কাল ১৯৬২) রচনার জন্য অ. কৃ. ব ১৯৬৪ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নরসিং দাস (বাঙলা সাহিত্য) পুরস্কারে সম্মানিত হন।

প্রয়াত প্রবীণ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৬৫ সালে তাঁর কায়েমি বাসস্থান দারভাঙ্গা থেকে অ. কৃ. ব-কে লিখেছেন :

'আপনার বইখানি অপূর্ব হয়েছে। অ. কৃ. ব-র নিজস্বতাটুকু আছেই রচনা-ভঙ্গিতে, সজীব, সমুজ্জ্বল; তার ওপর যে নতুন বিষয়টি ধরেছেন, সেটিকে অপূর্ব কৌশলে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। জাদুরই মধ্যে রহস্য-কৌতুক আছে. জাদুকরের মধ্যেও যে কিছু কম নয়, এটা আপনার বইখানি পড়বার আগে জানতাম না। এটা সম্ভব হয়েছে জাদু আর জাদুকরকে আপনি এতটা একাত্ম করে দেখাতে পেরেছেন বলেই। "ছুটি অলৌকিক কাহিনী" যেন এর চরমোৎকর্ষ। আপনাকে অভিনন্দিত করছি।'

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর সম্পাদিত "কথাসাহিত্য" মাসিকপত্রে (অগ্রহায়ণ, ১৩৯২) অ. কৃ. ব-র "জাদু-কাহিনী" গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন :

'জাদু-কাহিনীর আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের সরস রচনা-শৈলী। এই কারণে কাহিনী-গুলি যথার্থই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের দাবি করতে পারে। অজিতবাবু এই কাহিনীগুলি দ্বারা নিঃসন্দেহে বঙ্গ-সাহিত্যে একটি নূতন দিগন্তের সংযোজন করেছেন।'

কিন্তু মুশকিল এই যে, বইটির নামের অন্তর্গত 'জাদু' শব্দটি হয়তো অনেক সাহিত্যরসিক পাঠক-পাঠিকাকে দূরে সরিয়ে রাখে, যেমন বেশ কিছুদিন সরিয়ে রেখেছিল স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কেও। অ. কৃ. ব-কে তাঁর উপরি-উক্ত চিঠিখানা ডাকযোগে পাঠাবার পরে তিনি কয়েক-দিনের জন্য কলকাতায় এসে অবস্থান করেছিলেন এবং সেই সময়ে অ. কৃ. ব-র সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হলে পর তিনি অ. কৃ. ব-কে অকপটে বলেছিলেন :

'তোমার "জাদু-কাহিনী" বইটি পেয়ে বেশ কিছু-দিন শেলফেই রেখে দিয়েছিলাম, পাতা ওলটাই নি। ভেবেছিলাম ওটা ম্যাজিক সংক্রান্ত বই, সাহিত্যের বই নয়। ম্যাজিকে আমার তেমন উৎসাহ নেই। পরে যখন খবরের কাগজে দেখলাম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তোমার বইটিকে সেরা সাহিত্যগ্রন্থরূপে নরসিং দাস পুরস্কার দিয়েছে, তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বইটি পড়লাম, অভিভূত হলাম আর তোমাকে ঐ চিঠি লিখলাম।'

'জাদু' শব্দটি অনুরূপভাবেই কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কেও প্রথমে বিভ্রান্ত করে-ছিল, যখন দৈনিক "যুগান্তর" পত্রিকার তদানীন্তন রবিবাসরীয়-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক পরিমল

গোস্বামীর আগ্রহে অ. কৃ. ব-র "জাদু-কাহিনী" রচনা-মালার মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায়গুলি ধারা-বাহিকভাবে রবিবারের যুগান্তরে প্রকাশিত হতে শুরু করে (১৯৬০)। তখন আশুতোষবাবু ছিলেন পরিমল-বাবুর সহকারী। "যুগান্তর" অফিসেই আশুবাবু জনান্তিকে ডেকে বলেছিলেন, 'অজিতবাবু, আপনার মতো একজন বিশিষ্ট সম্মানিত সাহিত্যিকের এই অধঃপতন ঘটল কেন? আপনি শেষকালে জাদু নিয়ে পড়লেন?'

যুগান্তরে "জাদু-কাহিনী"র পর-পর কয়েকটি কিস্তি পড়ে আশুতোষবাবুর মত বদলে গিয়েছিল। তিনি অ. কৃ. ব-কে বলেছিলেন, 'অজিতবাবু, আপনাকে যা বলেছিলাম তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জাদুজগতে যে এমন অসাধারণ সাহিত্যের খোরাক আছে, তা আমি আগে কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। আপনার "জাদু-কাহিনী" পড়ে আমার মনে ভীষণ আগ্রহ হয়েছে একটি জাদুকর চরিত্রকে নায়ক করে একটি বড়ো জাদু-উপন্যাস লিখবার। কিন্তু জাদু বিষয়ে আমি তো প্র্যাকটিক্যালি কিছুই জানি না, একেবারে আনাড়ি। আপনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; আপনি তত্ত্ব আর তথ্য সহ নির্দেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন উপন্যাসটি লিখতে। এ ধরনের উপন্যাস তো বাঙলা ভাষায় এ পর্যন্ত কেউ লেখেন নি।'

শুনে অ. কৃ. ব বলেছিলেন, 'কিন্তু আমি নিজেই যে অনেকদিন ধরে ভেবে রেখেছি "প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক আমার বৃহৎ উপন্যাসটি (৪৫৪ পৃষ্ঠা) যেমন গড়ে উঠেছে সদ্যঃপ্রয়াতা নায়িকা প্রজ্ঞাপারমিতা রায়চৌধুরীকে কেন্দ্র করে, আর "সানাই" নামক ছোটো উপন্যাসটি (১০৪ পৃষ্ঠা) গড়ে উঠেছে ভূতপূর্ব বিরাট জমিদার উদয়নারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা চিত্রার বিবাহ-উৎসবানুষ্ঠানে ভারতের বৃদ্ধ সানাই-সম্রাট মকবুল হোসেনের শেষ সানাইবাদনকে কেন্দ্র করে—যার পরই সানাই-সম্রাট এদেশ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চলে যাবেন মক্কা শরীফে, সেখানেই বাকি জিন্দগিটা কাটিয়ে দেবেন আল্লার আরাধনায়—তেমনি একজন মহান জাদুকর চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি বড়ো জাদু-উপন্যাস লিখব, উপন্যাসটির নামও ঠিক করে রেখেছি "জাদুকর"।

আশুতোষবাবু বলেছিলেন 'তাহলে আমি আমার অনুরোধ ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি নিজেই যখন লিখবেন, তখন আর আমাকে সাহায্য করবেন কেন?'

অ. কৃ. ব বলেছিলেন, 'না, আপনি যখন অনুরোধ করেছেন, আপনার অনুরোধ আমি রাখব। শুধু জাদু-খেলার গুপ্ত কৌশলগুলো আপনাকে জানাব না, কারণ ওগুলো ট্রেড সিক্রেট। তা ছাড়া জাদু বিষয়ে আপনি যা যা জানতে চান সবই আপনাকে জানাব।'

অ. কৃ. ব অকৃপণভাবে তত্ত্ব আর তথ্য দিয়ে আশুতোষবাবুকে সাহায্য করেছিলেন, "জাদু কাহিনী" বাঁধাই বই হয়ে বাজারে বেরোবার আগেই তার সব-গুলো ছাপা ফর্মা আশুবাবুকে পড়তে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকটি আলোচনা-বৈঠকেও বসে-ছিলেন। তা ছাড়া, জাদু-জগৎ থেকে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ জাদুকর 'রয় দি মিস্টিক'-এর (যতীন্দ্রনাথ রায়) সঙ্গেও আশুবাবুর কয়েকটি আলোচনা-বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অ. কৃ. ব। জাদু বিষয়ক এই মূলধন-কে ভিত্তি করেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপন্যাস লিখেছিলেন "বাজীকর"। এবং ভূমিকায় তিনি অ. কৃ. ব-র কাছে ঋণ স্বীকার করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এটিই জাদুকর-চরিত্র-ভিত্তিক একমাত্র বাঙলা উপন্যাস। বলা হয়তো বাহুল্য, জাদুজগতের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা না থাকায়, উপন্যাসটি পুরোপুরি 'প্রামাণ্য' জাদু-উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি।

অ. কৃ. ব আশুতোষবাবুকে বলেছিলেন, 'আপনার "বাজীকর" উপন্যাস প্রকাশিত হবার বছর কুড়ি বাদে আমি আমার পরিকল্পিত "জাদুকর" উপন্যাসটি লিখতে শুরু করব।'

"বাজীকর" প্রকাশের পর পার হয়ে গেছে কুড়ি বছর এবং অ. কৃ. ব পদার্পণ করেছেন ৭৭ বছরে। তাঁর

মুখেই শুনেছি এবার তিনি "জাদুকাহিনী" দ্বিতীয় পর্ব এবং তার পাশাপাশি "জাদুকর" উপন্যাসটির রচনা শুরু করবেন। আমার মনে হয়, রচনাকর্ম এত বিলম্বিত হওয়ার ফল ভালোই হবে, পরিণততর সৃজনী কল্পনা-শক্তি নিয়ে লেখা উপন্যাসটি জাদুসাহিত্য হিসাবে উচ্চতর গুণমান লাভ করবে।

অ. কৃ. ব'র মতো একাধারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং প্রথম সারির জাদুবিশারদ এদেশে আর কেউ নেই।

অ কৃ. ব-র বিশিষ্ট বন্ধু আমাদের বিশ্ববিখ্যাত "জাদু-সম্রাট" পি. সি. (প্রতুলচন্দ্র) সরকার অ. কৃ. ব'র জাদু সম্পর্কিত মতামত এবং পরামর্শকে কতটা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুত্ব দিতেন, অ. কৃ. ব-কে লেখা জাদু-সম্রাটের একটি চিঠি ("জাদুকাহিনী" দ্বিতীয় সংস্করণে পি. সি. সরকার সম্পর্কিত সংযোজন অংশে মুদ্রিত) থেকেই তা বোঝা যাবে।

'আমার প্রদর্শনী আরো ভালো করবার জন্য আপনি যে গঠনমূলক সমালোচনা পাঠিয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার ব্ল্যাক-আর্ট প্রদর্শন একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে কিভাবে একটি নাটকের রূপ দেওয়া যায়, এ বিষয়ে আপনার কার্যকরী পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করব।

'জাদু জগৎ নিয়ে আপনি একটি উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছেন আমার নাম তার অন্তর্ভুক্ত করে, এতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। নানা দেশে জাদুকর রূপে সফরের বিবরণ নিয়ে আমাকে একটি আত্মজীবনী লিখতে বলেছেন; আপনার পরামর্শটি খুব ভালো লেগেছে এবং আমি তা করব ভেবেছি। কিন্তু আপনার সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে আমার চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হবে না। আপনি আমার জন্য যা কিছু করবেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞের চাইতেও বেশী হব।'

পি সি. সরকার (জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯১৩) এবং অ. কৃ. ব (জন্ম জুলাই ১৯১২)। দুজনই স্কুল জীবন থেকে সমান্তরালভাবে জাদুবিদ্যার অনুশীলন করে এসেছেন, কিন্তু সাহিত্যই অ. কৃ. ব-র জীবনে প্রধান হয়ে ওঠায় ছাত্রজীবনে কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকে জাদু প্রদর্শন করার পর তিনি আর জাদুমঞ্চে অবতীর্ণ হন নি। জাদু-চর্চার একেবারে প্রথম দিকে অসাধারণ জাদুকর 'রয় দি মিস্টিক'-এর জাদুপ্রদর্শন দেখে অভিভূত হয়ে তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল তাঁরই মতো অসাধারণ বিস্ময়স্রষ্টা জাদুকর হবার, তাঁর সবুজ রোমান্টিক মনে ধারণা জন্মেছিল বিশ্বজোড়া না হলেও অন্তত দেশ-জোড়া খ্যাতিমান জাদুকর হওয়ার চাইতে বড়ো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তাঁর দূরদর্শী পিতৃদেব তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার মধ্যে আছে সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা—সাহিত্যসৃষ্টিই তোমার আসল ক্ষেত্র, জাদুপ্রদর্শন নয়। 'হবি' বা শখ হিসাবে একটু-আধটু জাদুর অনুশীলন কর ক্ষতি নেই, তাতে আমি মানা করছি না। কিন্তু পেশায় বা নেশায় জাদুপ্রদর্শক হতে যেয়ো না।'

পৈতৃক উপদেশ মেনে নিয়েছিলেন অ. কৃ. ব। তিনি বন্ধু পি. সি. সরকারের মতো জাদুতে একান্ত-ভাবে আত্মনিয়োগ করলে সাহিত্যিক অ. কৃ. ব-কে আমরা পেতাম না। এবং সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় জাদুপ্রদর্শনের জগৎ তাঁকে পেয়ে খুব বেশি লাভবান হত না। কারণ অ. কৃ. ব নিজেই স্বীকার করেছেন—পয়লা সারির জাদুকর হবার মতো মঞ্চ-ব্যক্তিত্ব, বেপরোয়া সাহস, চটজলদি বুদ্ধি এবং অন্যান্য অপরিহার্য গুণ তাঁর ছিল না; যেমন ছিল পি. সি. সরকারের।

"জাদুকাহিনী" গ্রন্থের একেবারে প্রথমেই গ্রন্থকার (অ. কৃ. ব) সম্পর্কে প্রকাশকের তরফ থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা মুদ্রিত আছে:

'মঞ্চে, মহলে বা ময়দানে বিচিত্র বিস্ময়, আর রহস্য সৃষ্টি করাই যাদের পেশা বা নেশা, তাদের জীবনও তেমনি অসাধারণ বিস্ময়, রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা।

'এরা নানা নামে অভিহিত—ম্যাজিশিয়ান, জাদু-

কর, বাজিকর, ভেলকিওয়ালা, মাদারি। এদের তাক-লাগানো খেলাগুলোরও নানারকম নাম—ম্যাজিক, জাদু, ভেলকি, ভানুমতীর খেল, ভোজবাজি। এদের জগতে দীর্ঘদিন অন্তরঙ্গ বিচরণের ফলে এদের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক এই গ্রন্থে শুনিয়েছেন এদেরই কিছু বিচিত্র কাহিনী, যা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর।'

স্কুলজীবন থেকেই অ. কৃ. ব-র এই জাদুর নেশা তাঁর সাহিত্যনেশার সঙ্গে সমানভাবে সক্রিয়। প্রধানত ঢাকা এবং কলকাতা শহরে এবং উপকণ্ঠে অ. কৃ. ব এদের রহস্যসৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন শুধু তাৎক্ষণিক আনন্দরস আস্বাদনের জন্যই নয়, রহস্যসৃষ্টির পিছনে রহস্যস্রষ্টা মানুষগুলিকে জানবার গভীরতর উদ্দেশ্যে, তাদের জীবনদর্শন ও জীবনধারা সম্বন্ধে পরিচিত হতে।

অ. কৃ. ব জানেন, শিল্পের চাইতে শিল্পী বড়ো, কারণ শিল্পীর প্রকাশিত শিল্পকর্মে আমরা পাই তাঁর পুরো ক্ষমতার আংশিক প্রকাশমাত্র। কোনো শিল্পীর পক্ষেই তিনি যা দিতে পারেন তার সবটুকু দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

অ. কৃ. ব তাই জাদুকরদের বিস্ময়সৃষ্টির চৌম্বক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে শুধু তাদের প্রদর্শনের আনন্দ আস্বাদনেই থেমে থাকতে পারেন নি, তাদের চিন্তা-ধারা, ভাবধারা, জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছেন জীবনকৌতূহলী দরদি মন নিয়ে।

স্কুলজীবনেই ইংরাজি "বাইবেল"-এর 'ওল্ড টেস্টা-মেনট' অংশে সৃষ্টিপ্রকরণ পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন অ. কৃ. ব। তার প্রথম দিকেই তিনি পড়েছিলেন যে আগে ছিল বিশ্বজোড়া অন্ধকার। তারপর ঈশ্বর বললেন, 'আলোর আবির্ভাব হোক', অমনি আবির্ভূত হল আলো, আগে যার অস্তিত্ব ছিল না। এটা হল কিছু-না থেকে কিছু সৃষ্টি। এই ধারণা থেকেই অ. কৃ. ব তাঁর অনন্য "জাদু-কাহিনী" গ্রন্থটির প্রস্তাবনা শুরু করেছিলেন এইভাবে :

'জাদুকাহিনীই দুনিয়ার সবচেয়ে পুরোনো কাহিনী, আর ঈশ্বরই হচ্ছেন দুনিয়ার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর। তাঁরই জাদুতে অনন্ত শূন্যের বুকে সৃষ্ট হয়েছিল বিস্ময়ে ভরা এই বিশ্ব। ঈশ্বর-সৃষ্ট বিস্ময়-গুলো যুগের পর যুগ দেখতে-দেখতে ক্রমে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল মানুষের চোখ থেকে আর মন থেকে। ঈশ্বরের জাদু ভুলে মানুষ তখন মানুষের জাদুতে মুগ্ধ হতে শুরু করল।'

ভারতের আধুনিক জাদুবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে চার-জন বিরাট পুরুষ গণপতি চক্রবর্তী (১৮১৫-১৯৩৯), রাজা বোস (১৮১৮-১৯৪৮), 'রয় দি মিস্টিক' মঞ্চ-নামে খ্যাত যতীন্দ্রনাথ রায় (১৮৯১-১৯৭৭) এবং পি. সি. (প্রতুলচন্দ্র) সরকার (১৯১৩-১৯৭১)। অ. কৃ. ব-র সৌভাগ্য হয়েছিল এই চারজনের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের এবং শেষোক্ত তিনজনের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার। এঁরা চারজনই ছিলেন অসাধারণ উচ্চমানের জাদুকর। এঁরা জাদু-শিল্পকে ঐশ্বরিক শিল্প বলেই শ্রদ্ধা করতেন।

যাঁরা উচ্চমানের জাদুকর, তাঁরা বোঝেন জাদু আছে সঙ্গীতে এবং সাহিত্যে। দেখা গেছে মেঘমল্লার ভালোভাবে গাওয়া হলে মেঘবৃষ্টির ইলিউশন শ্রোতার মনে, এমনকী মন থেকে দৈহিক অনুভূতিতেও তৈরি হয়।

সঙ্গীতের মতো সাহিত্যেও জাদু আছে। যেমন সার্থক ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক উপন্যাস রচনার জাদুতে আমাদের মনে অতীতের ইলিউশন সৃষ্টি করে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পি. সি. সরকারের সঙ্গে সাহিত্যিক অ. কৃ. ব-র বন্ধুত্ব অমন প্রগাঢ় হওয়ার কারণ সরকার সাহিত্যকে দেখতেন জাদুকরের দৃষ্টিকোণ থেকে, সাহিত্যকে প্রয়োগ করতে চাইতেন জাদুর কাজে। সাহিত্য ও সঙ্গীতের মতোই নাট্যাভিনয়েও আছে জাদু। রামের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়িকে দেখে আমাদের মনে এই বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল যে আমরা অযোধ্যায় রামরাজত্বে চলে গেছি।

উচ্চমানের জাদুকর তাই জাদু-পরিবেশনে শিল্প-সম্মতভাবে সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, নাটকের প্রয়োগ করে উচ্চমানের বিভ্রম সৃষ্টি করেন। এটি পারা আর না-পারাতেই বড়ো আর ছোটো জাদুকরের প্রভেদ।

তা যাই হোক, জাদুশিল্পকে এখন আরো উঁচু স্তরে উঠতে হবে এবং মনে রাখতে হবে জাদুকরেরা এখন আর শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনকারী নন; তাঁদের নিতে হবে এনটারটেনার+এডুকেটরের ভূমিকা। যেমন চারণকবিরা একসময়ে উদ্বোধক গান গেয়ে দেশ-বাসীর বিবেককে জাগাতেন, তেমনি ভূমিকা নিতে হবে জাদুকরদের, এবং এ ব্যাপারে জাদুশিল্পের সম্ভাবনা অসীম।

কোনো একজনমাত্র নির্দিষ্ট জাদুকরকে নয়, দেশী বিদেশী অনেক জাদুকরের চরিত্র থেকে বিভিন্ন মহৎ গুণ তুলে এনে বহু তিল মিলিয়ে তিলোত্তম জাদুকর চরিত্র সৃষ্টি করে তাঁর বহুদিনের পরিকল্পিত "জাদুকর" উপন্যাসটি রচনা করবেন অ. কৃ. ব। আশা করা যায় তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থ "জাদুকাহিনী"-র মতো তাঁর "জাদুকর" উপন্যাসটিও জাদুসাহিত্যের একটি 'ক্লাসিক' হবে।

কলকাতা প্রতিষ্ঠার তিনশ বছর উদ্‌যাপন এবং "চতুরঙ্গ"

কলকাতার প্রতিষ্ঠাপর্বের সময় নিয়ে যতই বিতর্ক থাক, এই মুহূর্তে তিনশ বছর উদ্‌যাপনের উপলক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, বিশেষ করে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বসু বিজ্ঞানমন্দির, সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস, ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অবদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিছু মূল্যায়নধর্মী নিবন্ধ এই বছরের বিভিন্ন সংখ্যায় আমরা ছাপব। "চতুরঙ্গে"র ঐতিহ্য অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই নিবন্ধগুলি লিখিত হবে দেশের জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা।

মতামত

জাঁ পল সার্ত্র্-এর "লে মো"

জুন (১৯৮৯) মাসের "চতুরঙ্গ"-তে 'সার্ত্র-এর ছেলেবেলার আত্মকথা' শিরোনামে জাঁ পল সার্ত্র-এর "লে মো" (Les mots) বইটির 'শব্দ' এই নামের অনুবাদগ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। সমালোচনাটি পড়ে যে কয়েকটি কথা স্বতঃই মনে হয়েছে সংক্ষেপে লিখে জানাচ্ছি।

"Les mots"—এই ফরাসি নামটির অনুবাদ 'শব্দ' (বা মঞ্জুষবাবুর 'শব্দাবলী' বা 'শব্দগুলি') আক্ষরিক অর্থে সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়তো যায়, কিন্তু নিজের ছেলেবেলার আত্মকথাকে "Les mots" এভাবে অভিহিত করার পেছনে লেখকের কোনো বিশেষ মনোভাব প্রকাশ করার ইচ্ছার আভাস নিশ্চয়ই ধরা পড়ে না। "Les mots" বইটির ইংরেজিতে অনুবাদকে 'Words' এই নাম দেওয়া হয়েছে দেখে সঙ্গে-সঙ্গেই "হ্যামলেট" নাটকের হ্যামলেট চরিত্রটির উচ্চারিত 'Words, words, words'-এর কথা সহজেই মনে হতে পারে। সে নাটকটিতে হ্যামলেট নিরিবিলিতে নিবিষ্টভাবে বই পড়ার সময় বাচাল পোলোনিয়স এসে অহেতুক প্রশ্ন করে তাঁকে বিরক্ত করে। সে বিরক্তি চেপে যত শিগগির সম্ভব ওই বাচালটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পোলোনিয়সের প্রশ্নের—'What do you read, my lord?'—জবাবে হ্যামলেট বলেন—'Words, words, words'। সার্ত্র-ও হয়তো ভবিষ্যৎ পাঠক-সমালোচকদের সম্ভাব্য প্রশ্নজিজ্ঞাসার জবাব নিজে থেকেই তাঁর বইটির নামের মধ্যে দিয়ে রেখেছেন। সেক্ষেত্রে "Les mots" নামটি ব্যবহারের পেছনে সার্ত্র-এর মনোভাবটি ধরা পড়তে পারে যদি বইটির অনুবাদের নাম দেওয়া যায় "কিছু কথা মাত্র" বা "কথা আর কথা" ('শব্দ' বা 'শব্দাবলী' বা 'শব্দগুলি' নয়) যার অর্থ দাঁড়াবে কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে জানিয়ে দেওয়া যে এ বইতে তেমন গুরুতর বস্তু কিছু নেই যা নিয়ে পাঠকরা বা বিশেষ করে সমালোচকরা ভেবে মরতে বা মাথা ঘামাতে পারেন—এ তো "কিছু কথা মাত্র" বা এতে আছে "কথা আর কথা"—'Words, words, words'—"Les mots".

(২) সমালোচক এক জায়গায় "অয়ডিপাউস কমপ্লেক্স" (পৃষ্ঠা ১৬৭) কথাটি ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, "অয়দিপাউস" এই উচ্চারণের ভেতর দিয়ে প্রাচীন গ্রীক নাটকের যে চরিত্রকে বোঝানো হয়েছে, তাকে ইংরেজিতে Oedipus (ঈডিপাস) এই বানানে দেখানো হয়। নামটির গ্রীক বানান রোমান হরফে দাঁড়ায় Oidipous এবং নামটির এই গ্রীক রূপের উচ্চারণ হবে "অয় দি পুস" ("অয়দি-পাউস" কখনই নয়) কারণ 'ou' এই দুটি স্বরবর্ণ প্রাচীন গ্রীক উচ্চারণে হয় 'উ', 'আউ' নয়। অথচ এই ভুল "অয়দিপাউস" উচ্চারণটি লেখায় এখানে সেখানে অনেক সময়ই দেখা যায়, সম্ভবত এই কারণে যে "বহুরূপী"র মতো সম্ভ্রান্ত নাট্যসংস্থাও ওই রাজার নামের নাটকটি মঞ্চস্থ করার বিজ্ঞাপনে অনবরত এই ভুল "অয়দিপাউস" উচ্চারণটি দেখিয়ে এসেছেন।

(৩) সমালোচনাটির শেষের দিকে (পৃষ্ঠা ১৬৯) Baudelaire এবং Voltaire—এই দুটি ফরাসি নামের উচ্চারণ সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন "বো দ লে য়া র" বা "ভ ল তে য়া র" (যে উচ্চারণ সার্ত্র-এর বই-এর অনুবাদগ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে) না লিখে সম্ভবত ব দলের বা ভ লতের লেখা ফরাসি উচ্চারণের প্রেক্ষিতে ঠিক হত। কিন্তু ঐ দুটি নামের মধ্যেই যে 'ai' এই দুটি স্বরবর্ণ একসঙ্গে আছে তার ঝোঁক (emphsis) টি বোঝাতে হলে ভলতেয়ার/ভলতের বা বোদলেয়ার/বোদলের (অর্থাৎ 'এয়া' বা 'এ') লিখে বোঝানো যাবে না। একটি 'হ'ফলা যোগ করে দিলে অর্থাৎ বোদল্যের বা ভলত্যের লিখলে ওই ঝোঁকটি দেখানো যেতে পারে বলে মনে হয়।

কল্যাণকুমার দত্ত, কল্যাণী/নদীয়া

ভুল-সংশোধন

"চতুরঙ্গে"র জুলাই সংখ্যায় তৃপ্তি মিত্র স্মরণে খালেদ চৌধুরীর রচনাটিতে কয়েকটি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। এজন্য আমরা পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। তাঁরা অনুগ্রহ করে ভুলগুলি সংশোধন করে নিলে আমরা বাধিত হব।

পৃষ্ঠা	লাইন	ভুল ছাপা হয়েছে	সঠিক হবে
২৫৬	২০	জ্ঞানপ্রকাশ	চারুপ্রকাশ
২৫৬	২১	ছোটো	কথাটি বাদ যাবে
২৫৭	২১	অশোভনভাবে	অসফলভাবে
২৫৯	১৬	পাড়ের	ফুলের
২৬২	১১	করলেন।	করলেন "রাহুগ্রাস"।

২৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটির পাঠ হবে—'ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালেই শম্ভু মিত্র "বহুরূপী" করে ফেলেছেন।'